স্বস্তিকা

দাম : পাঁচ টাকা
১৬ মে, ২০১১, ১ জ্যৈষ্ঠ - ১৪১৮
৬৩ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা

আর কত দুর্নীতি ?

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

'ম্যান অফ দ্য সিরিজ' যদি নির্বাচন কমিশন হয়, 'ভিলেন অফ দ্য সিরিজ' তবে সংবাদমাধ্যম ❑ গূঢ়পুরুষ ❑ ৮

কিস্‌সা কুর্সিকা ❑ ৯

দুর্নীতির কেন্দ্র, কেন্দ্রের দুর্নীতি ❑ তারক সাহা ❑ ১১

ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চাই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ❑ প্রফুল্ল গোরাডিয়া ❑ ১৩

ক্যানসারের মতো ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে দুর্নীতি ❑ মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলী (অবঃ) ❑ ১৪

প্রগতি প্রতিবন্ধক দুর্নীতি আর কালো টাকা ❑ ডঃ অশ্বিনী মহাজন ❑ ১৬

উলফা জঙ্গিদের দরাজ হাতে টাকা দিচ্ছে সরকার ❑ ১৯

খালেদা আমলে কয়েক হাজার হিন্দু মহিলা গণধর্ষিতা ❑ ২০

লাদেন খতমে জঙ্গিদের মনোবল ভাঙ্গবে বাংলাদেশে ❑২০

কন্যাভ্রূণ হত্যায় নারী-পুরুষ অনুপাতে দুস্তর ব্যবধান হরিয়ানায় ❑ ২১

মার্কিন ভূতের ছায়ায় ভয়ে কাঁটা আলিমুদ্দিন ❑ ২৩

শ্রী অরবিন্দের 'সাবিত্রী' ❑ নির্মল কর ❑ ২৪

কর্মদাস হওয়ার বিড়ম্বনা ❑ চতুর্থ পাণ্ডব ❑ ২৫

শ্রদ্ধাঞ্জলি : পরলোকে শ্যামাপ্রসাদ-দুহিতা সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ২৮

নেহরু-গান্ধী পরিবারের জাতি-ধর্ম গোপন থাকবে কেন? ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩০

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ১৮** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑ **নবাঙ্কুর : ২৯** ❑ **সমাবেশ-সমাচার : ২৯** ❑ **রঙ্গম : ৩১, শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

আর কত দুর্নীতি? — ১৪

সম্পাদকীয়

জাতীয় স্বার্থ সর্বাগ্রে

নৃশংস সন্ত্রাসবাদী দৈত্য ওসামা বিন লাদেন নিহত। গত কয়েক দশক জুড়িয়া জেহাদের নামে সারা বিশ্বে শত শত নরনারীর রক্তের হোলি খেলায় যে মাতিয়াছিল, তাহার এই নির্মম পরিণতিতে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যথার্থই বলিয়াছেন, ওসামা নিহত হওয়ায় ন্যায় বিচারই রক্ষিত হইয়াছে। ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের প্রতিশোধ হিসাবে আমেরিকার এই লাদেন হত্যার অভিযান বিশ্বের কাছে এক স্পষ্ট বার্তা ঘোষণা করিয়াছে—সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করিতে বিশ্ব কৃতসংকল্প।

সন্ত্রাস দমনে মার্কিন বাহিনীর এই অভিযান তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের দাবী রাখে। কেননা ভারতের জাতীয় স্বার্থের সহিত সেইগুলি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। প্রথমত, ইহা স্পষ্ট যে ওসামা বিন লাদেনের নিহত হওয়ার ঘটনা শুধু পাকিস্তানের মুখোশ খুলিয়া দেয় নাই, পাকিস্তানী সেনা-জেহাদীদের গোপন ষড়যন্ত্রের বিষয়টিও স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ হইতে মাত্র ৬০ মাইল দূরে অ্যাবোটাবাদ নামে এক পাহাড় ঘেরা শহরের একটি প্রাসাদোপম বাড়ীতে গত পাঁচ বছর ধরিয়া লাদেন বসবাস করিতেছিল—যাহা কার্যত সেনাছাউনী যেখানে শত শত পাক-সেনা শিবির করিয়া বসিয়া আছে এবং কাকুল মিলিটারি অ্যাকাডেমিও সেখানে রহিয়াছে। ইসলামাবাদ-রাউলপিন্ডির কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমোদনে অ্যাবোটাবাদে ২০০৫-এ তৈরি একটি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাযুক্ত বাড়ীতে ওসামা বসবাস করিতেছিল—পাক সরকার বা সেনাবাহিনী কেউই তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ বা না-জানার ভান করিতে পারিবে না।

পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদ রপ্তানি করিত—সারা বিশ্বের কাছে তাহা আজ দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকাকেও তাহাদের পূর্বেকার কাজের ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। বহু বছর ধরিয়া সন্ত্রাসবাদ দমনে তাহাদের 'সহযোগী' হিসাবে আমেরিকার প্রশাসন পাকিস্তানকে লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। অথচ অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, পাকিস্তান জঙ্গিদের পুষিতেছে জানিয়াও মার্কিনীরা বলিতেছে, পাকিস্তানের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব বজায় থাকিবে। শুধু তাই নয়, ভারতকেও তাহাদের পথের পথিক হইবার জন্য চাপ দিয়া যাইতেছে। দুর্ভাগ্যের হইলেও সত্য, আমাদের প্রধানমন্ত্রীও আমেরিকার পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহিতেছেন। আমাদের বিদেশমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদিও অন্য সুরে কথা বলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রীর অবশ্য তাহাতে কিছু যায় আসে নাই। তৃতীয়ত, লাদেনের নিহত হওয়ার ঘটনা আমেরিকার পাক-আফগান নীতিতে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিবে কিনা এই বিষয়ে এখনই কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়তো সমীচীন হইবে না। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে তালিবান অধ্যুষিত আফগানিস্তানে সেনা রাখিবার ইচ্ছা আমেরিকা ক্রমশ হারাইয়া ফেলিতেছে। ধীরে অথচ স্পষ্টতই আমেরিকা নিজেদের সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া আফগানিস্তানের দেখভাল পাকিস্তানের হাতেই তুলিয়া দিতে চায়। 'সহযোগী' পাকিস্তানের সহিত আপোষ করিতে কি আফগানিস্তান হইতে কর্মরত ভারতীয়দের ফিরাইয়া আনিবার জন্য মনমোহন সিং-এর উপর এইবার চাপ সৃষ্টি করা হইবে?

আমেরিকা তাহার জাতীয় মর্যাদা তথা স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া সেনা অভিযান চালাইয়াছে। অথচ ভারতের সংসদের উপর কিংবা ২৬/১১-তে মুম্বাই-এ জঙ্গিদের আক্রমণের পর পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিয়া দিবার সাহস ভারত দেখাইতে পারে নাই। এখনও সংসদের আক্রমণকারীদের পাণ্ডা আফজল গুরু ফাঁসির আসামী হইলেও তাহাকে বহাল তবিয়তে রাখিবার সব ব্যবস্থাই মনমোহন-সোনিয়া নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার করিয়াছে। মুম্বাইয়ে শত শত নিরীহ মানুষের হত্যাকারী কাসভও ইহার ব্যতিক্রম নয়। এই সরকার বা তাহার প্রধানমন্ত্রীকে কেহ যদি 'নপুংসক' বলিয়া চিহ্নিত করিয়া থাকে, তবে তাহা 'বিলো দি বেল্ট' বলিয়া যাহারা সোচ্চার হয়, তাহারাই নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতে জাতীয় মর্যাদা তথা স্বার্থকে বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। স্বদেশের স্বার্থের কষ্ঠিপাথরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করা যাইতেই পারে, কিন্তু তাহাদের কাছ হইতে যাহা শিখিবার তাহা অবশ্যই শিখিতে হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

চাই কি?—পরিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখধোয়া, দাঁতমাজা—সব চাই, কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই। রাস্তাঘাটও পরিষ্কার চাই। পরিষ্কার রাঁধুনি, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই! আবার পরিষ্কার মনোরম স্থানে পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই—'আচারঃ প্রথমা ধর্মঃ।' আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচার ভ্রষ্টের কখন ধর্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখছ না, দেখেও শিখছ না? এত ওলাউঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া—কার দোষ? আমাদের দোষ। আমরা মহা-অনাচারী!!!

—স্বামী বিবেকানন্দ (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান

ভারতের প্রজ্ঞার দিকে চেয়ে আছে বিশ্ব : ভাগবত

ডঃ কৃষ্ণবিহারী মিশ্রকে মানপত্র- চেক দিচ্ছেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। সঙ্গে ডঃ যোশী ও অন্যান্যরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ''আজকের দেশের বিক্ষিপ্ত পরিস্থিতি দেখে আমরা বিচলিত হই। কেন এরকম হলো? মনে হচ্ছে, সবকিছু যেন ভগবানের ভরসাতে চলছে। একটা সময়ে তো অন্যেরা ভারতকে মৃত বলে মনে করত। ওটাই যথাস্থিতি বলে মনে করা হোত। 'ভারত' যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় প্রজ্ঞার অনুগমন করবে না ততক্ষণ সবকিছু ঠিক হবে না। আগে মুষ্টিমেয় লোকেরা একথা বলতেন, এখন সবাই একথা মেনে নিচ্ছেন। সারা পৃথিবী সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য ভারতের দিকে ভারতীয় প্রজ্ঞার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।'' উপরোক্ত মন্তব্য করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। গত ৮ মে মহাজাতি সদনের শ্রোতায় পরিপূর্ণ সভাগারে ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন।

তিনি আরও বলেন, যারা দেশের জন্য প্রামাণিকতা ও নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে কাজ করেন তাদের বক্তব্যের সারও ওই একই। আর তা হলো, ভারতকে ভারতীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই চলতে হবে।

কার্যকর্তা হওয়ার জন্যই সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ : মোহনরাও ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি : তাঁতিবেড়িয়া॥ ''দেবস্থানে গিয়ে দেবতার দর্শন করে না ফিরলে কোনও ফল হয় না। সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে এসে সঙ্ঘের কার্যকর্তা হয়ে অপরকে কার্যকর্তা বানানোর যোগ্য হয়েই ফিরতে হবে। বর্গ তো শিক্ষক ব্যবস্থাপক শিক্ষার্থী সকলের। সব ছোটখাটো ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। সবার জন্যই শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ। বিদ্যা ও অর্থ অর্জনের জন্য কষ্ট করতে হয়। আমরা কেউ মনোরঞ্জনের জন্য এখানে আসিনি। অভিজ্ঞদের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করার রয়েছে।''

বর্গের উদ্বোধন করছেন সরসঙ্ঘচালকজী, সঙ্গে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অতুল কুমার বিশ্বাস।

গত ৮ মে সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ উদ্বোধন করার পর ভাষণ প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন সঙ্ঘের পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহনরাও ভাগবত। এদিন তাঁতিবেড়িয়া শিশুমন্দিরের হলঘরে প্রায় তিনশত স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তার উপস্থিতিতে ভারতমাতার ছবির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে বর্গের সূচনা করেন সরসঙ্ঘচালকজী। এটি একটি ব্যতিক্রমী কার্যক্রম। সাধারণত, সরসঙ্ঘচালকজী কেবলমাত্র সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ ও তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গেই যান। কলকাতায় থাকার কারণে তিনি দক্ষিণবঙ্গের কার্যকর্তাদের অনুরোধে বর্গে আসেন। বর্গের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি তথা উলুবেড়িয়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পরিচালিত হিন্দু মিলন মন্দিরের সম্পাদক দেবানন্দ কয়ালও বক্তব্য রাখেন। ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বর্গের সর্বাধিকারী সঙ্ঘের উলুবেড়িয়া মহকুমা সঙ্ঘচালক প্রভাত কুমার মণ্ডল। কার্যবাহ কাজলবরণ সিংহ। দক্ষিণবঙ্গের ১৪০টি স্থান থেকে ২০৯ জন এবং উত্তরবঙ্গ থেকে তিনজন স্বয়ংসেবক বর্গে যোগ দিয়েছেন। মুখ্যশিক্ষক হাওড়া জেলা শারীরিক প্রমুখ অশোক অট্ট এবং সর্বব্যবস্থা প্রমুখ বিভাগ কার্যবাহ তাপস ভট্টাচার্য। দক্ষিণবঙ্গের সহ-প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় পুরো সময় বর্গে থাকছেন।

ভারতীয় প্রজ্ঞাকে পুনর্জাগরিত করার প্রয়াস অনেকেই করেছেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ভারতীয় প্রজ্ঞাকে জাগ্রত করা, তাকে একটা বিশিষ্ট স্বরূপ দেওয়ার নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। এটা কে করেছেন তার খোঁজ করলে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব-এ গিয়ে পৌঁছতে হয়। তিনি সবরকম পূজা-পদ্ধতির অনুসরণ করে নির্দিষ্ট সত্যে পৌঁছেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে আচরণ করেছেন, সহজ সরল ভাষায় অন্যদেরকে সেই পথে চালিত করেছেন। জাতীয় জাগতিক জীবনে যাঁরা যাঁরা এই পদ্ধতিতে অন্যদের প্রেরণা দেওয়ার কাজ করেছেন, তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটা নাম সামনে আসে—তিনি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার। তাঁর সর্বস্ব ত্যাগময় জীবনে কৃতিরূপে যা ফুটে উঠেছে তা হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। একক প্রচেষ্টায় প্রায় কপর্দকশূন্য এক ব্যক্তি এই কাজ করেছেন। সমাজের প্রতি অকৃত্রিম আত্মীয়তার ভাব ও সকলের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার। উদার, স্মিত অথচ তেজস্বী এক ব্যক্তিত্ব। সেই সময়ের প্রচলিত সব দেশহিতকর কাজে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। মুখে বললেও অনেকে যে কাজ করেননি তা তিনি করেছেন। তাঁর নিজের বাসস্থানও ছিল না। তাঁর দাদার বাড়িতে তিনি থাকতেন। পরে সঙ্ঘ তা তাঁর ভাইঝি-জামাই-এর থেকে কিনে সংরক্ষণ করছে। আর যে সব সম্পত্তি রক্ষিত আছে তা হলো—তাঁর একটা ফুটিফাটা কোট, ছড়ি, থালা ও জুতো। তিনি ১৯২০-তে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রমুখ ছিলেন। তিনি নিজের উদ্যোগে তিনটি প্রস্তাব অধিবেশনে এনেছিলেন—(১) 'গোহত্যা বন্ধ, (২) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, (৩) স্বাধীনতার পর সারা পৃথিবীর' গরীব দেশগুলোকে পুঁজিবাদের কবল থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার'। তাঁর এক বন্ধু ছিলেন সাম্যবাদী ডঃ রুইকর। তাঁর মতে ডাঃ হেডগেওয়ার ছিলেন পুঁজিবাদী। যদিও দারুণ আন্তরিকতা ছিল উভয়ের মধ্যে।

৯৭ বছর বয়সী বাপুরাও ডাক্তারজীর অপরিসীম স্নেহ-ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। ত্যাগ, তপস্যা, সংযম ও সংগঠকের মূর্ত বিগ্রহের উদাহরণ অথচ ত্যাগের কোনও অহঙ্কার তাঁর ছিল না। নিজেকে সঙ্ঘের জন্মদাতা নয়, 'ধাত্রী' বলেছেন। তাঁর প্রবর্তিত পথই ভারতের উত্থানের পথ বলে মোহনজী মন্তব্য করেন। এদিনকার সভায় অন্যতম বক্তা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মুরলীমনোহর যোশী বলেন, তর্ক, বুদ্ধি নয়, হৃদয় দিয়ে দেশের কোটি কোটি মানুষকে যুক্ত করতে হবে। ভারতের বৈশিষ্ট্য—বিবিধতা মেঁ একতা, বসুধৈব কুটুম্বকম্ এবং একম্ সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। পশ্চিম নয়, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে দেশের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রজ্ঞা সম্মানে ভূষিত ডঃ কৃষ্ণবিহারী মিশ্র এই সম্মানে ভূষিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। সভা পরিচালনা করেন ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠি এবং ধন্যবাদ জানান মহাবীর বাজাজ। স্বাগত ভাষণ দেন প্রবীণ সমাজসেবী যুগলকিশোর জৈথেলিয়া। শ্রী মিশ্রকে পুরস্কারের স্মারক ও ৫১ হাজার টাকার চেক তুলে দেন সরসঙ্ঘচালক মোহনজী। পৌরোহিত্য করেন কর্ণাটকের প্রাক্তন রাজ্যপাল ত্রিলোকীনাথ চতুর্বেদী।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সমীক্ষা

একবিংশ শতাব্দীর শেষে চীনের দ্বিগুণ হবে ভারতের জনসংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগামী ২০৬০ সালের মধ্যেই ভারতের জনসংখ্যা পৌঁছে যেতে পারে ১.৭১৮ বিলিয়ন অর্থাৎ ১৭১.৮ কোটির কাছাকাছি। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পপুলেশন-ডিভিশনের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমনই তথ্য। সেই প্রতিবেদনে একথাও বলা হয়েছে যে, ২০৬০-এর পর জনসংখ্যা এদেশে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। জনসংখ্যার শীর্ষে পৌঁছনোর পর ভারত-ই বিশ্বের প্রথম জনবহুল দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এই রেকর্ড সংখ্যক জনসংখ্যা ভবিষ্যতে আর কেউ ছুঁতে পারবে না বলেও মন্তব্য করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

গত ৩ মে তাদের প্রকাশিত 'পপুলেশান প্রজেকশানে' রাষ্ট্রপুঞ্জ দেখিয়েছে ২০৩০ সালেই সারাবিশ্বে সবচেয়ে বড় জনসংখ্যার অংশীদার হবে ভারত। এরপরেই বিশ্ব-জনসংখ্যা থেকে অংশ কমবে ভারতের এবং সেই জায়গাটা আফ্রিকা পূরণ করবে বলেও মন্তব্য করা হয়েছে সেই প্রতিবেদনে। ২০২৫ সাল নাগাদ চীনের জনসংখ্যা পৌঁছতে পারে ১.৩৯৫ বিলিয়ন অর্থাৎ

জনবহুল গ্রহ			
সম্ভাব্য জনসংখ্যা (কোটিতে)			
বছর	**ভারত**	**চীন**	**বিশ্ব**
২০১০	১২০	১৩০	৬৯০
২০৫০	১৭০	১৩০	৯৩০
২১০০	১৬০	৯০	১০১০
মিডিয়ান এজ			
বছর	**ভারত**	**চীন**	**বিশ্ব**
২০১০	২৫১০	৩৪৫০	২৯২০
২০৫০	৩৭২০	৪৮৭০	৩৭৯০
২১০০	৪৫৯০	৪৬২০	৪১৯০

১৩৯.৫ কোটিতে। প্রকৃতপক্ষে চীনের জনসংখ্যা যখন সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছবে তার পূর্বেই সেই জনসংখ্যাকে অতিক্রম করে যাবে ভারত।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের জনসংখ্যা বিষয়ক প্রতিবেদনটি বলছে, ২০৬০ সালের পর থেকে ভারতের জনসংখ্যা কমবে। যদিও তার ৩৫ বছর আগে থেকেই জনসংখ্যা কমতে শুরু করে দেবে চীনের। তবে শতাব্দীর প্রান্তে হ্রাসমান ভারতীয় জনসংখ্যাও চীনের দ্বিগুণ হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, বিশ্ব জনসংখ্যার নিরীখে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ২০১০ সালের সংস্করণটিতে সাম্প্রতিকতম বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে এনিয়ে সর্বশেষ সংস্করণটি ২০০৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ২০১০-এর প্রতিবেদনে জাতীয় ট্রেন্ড ইত্যাদির ওপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ট্রেন্ড-কে খুব খারাপও নয়, খুব ভালও নয়—এমন একটা মাঝামাঝি পর্যায়ে রেখেছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশ্লেষকরা। সবমিলিয়ে হিসেবটা এরকমই দাঁড়াচ্ছে যে, ২০৫০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বের জনসংখ্যা ৯.৩১ বিলিয়ান অর্থাৎ ৯৩১ কোটি হবে। ২০০৮-এর সংস্করণের তুলনায় যা ১৫৬ মিলিয়ন অর্থাৎ ১৫.৬ কোটি বেশি বলে দেখানো হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীর শেষে সারা বিশ্বের জনসংখ্যা ১০.১ বিলিয়ান অর্থাৎ ১০১০ কোটি ছুঁয়ে ফেলবে। এই বছরের ৩১ অক্টোবর বিশ্ববাসী ৭০০ কোটি জনসংখ্যায় উন্নীত করতে পারবে বলে অভিমত পোষণ করা হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের জনসংখ্যা প্রজেকশানে।

‘ম্যান অফ দ্য সিরিজ’ যদি নির্বাচন কমিশন ‘ভিলেন অফ দ্য সিরিজ’ তবে সংবাদমাধ্যম

গূঢ়পুরুষের

কলম

এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে তখন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ইতিহাসের দীর্ঘতম ভোটদান পর্ব শেষে ফলাফল ঘোষিত হয়ে গেছে। তাই এখনই উপযুক্ত সময় ফেলে আসা সময়ের ভাল মন্দ বিচার করার। আমরা কী দেখলাম, কী শুনলাম, কী পেলাম এবং কী হারালাম তার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের এইতো উপযুক্ত সময়। নির্বাচনের সময় দলমত নির্বিশেষে প্রথমেই এবার যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ‘অনৈতিক’ মনে হয়েছে তা’ নিশ্চিতভাবে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা। কলকাতার ছোটবড় সব দৈনিক সংবাদপত্র, টিভি সংবাদ চ্যানেল খোলাখুলিভাবে হয় তৃণমূল-কংগ্রেস জোট নতুবা বামজোটকে সমর্থন করে টানা প্রচার চালিয়েছে। এই প্রচার চলেছিল সাংবাদিকতার সমস্ত নীতি। আদর্শকে এক কথায় আবর্জনার ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাজনৈতিক মাস্তানির চালে। সাংবাদিকদের কথাবার্তায়, লেখায় স্পষ্ট বোঝা গেছে তাঁরা কোনও বিশেষ দল বা জোটের পক্ষ নিয়ে প্রচারে নেমেছেন। সাংবাদিকরা দলীয় কর্মীদের মতো আচরণ করবেন এটা এতকাল অচিন্ত্যনীয় ছিল। এবার দেখা গেছে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ ছয় দফার ভোটের সময় বিভিন্ন এলাকায় প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকরা ভোটের খবর দেওয়ার নামে বাস্তবে কোনও বিশেষ জোট প্রার্থীর পক্ষে অথবা বিপক্ষে কাল্পনিক তথ্য দিয়ে ভোটদাতাদের শেষ বেলায় বিভ্রান্ত করার প্রচার পুরোদমে চালিয়ে গেছেন। ছয় দফার প্রতিটি পর্বে যখন নির্বাচন বিধি মেনে রাজনৈতিক দলগুলি প্রচার সভা বন্ধ করেছে ঠিক তারপরেই টিভি চ্যানেলে চালানো হয়েছে যুযুধান দুই পক্ষের নেতা নেত্রীদের পুরানো সাক্ষাৎকারের টেপ। যে সাক্ষাৎকারের মূল লক্ষ্য ছিল দলীয় প্রচার। যুক্তি দেখানো হয়েছে, রাজনৈতিক দলের প্রচার ভোট গ্রহণের নির্দিষ্ট সময়ের আগে বন্ধ রাখতে হয়। সংবাদমাধ্যমের সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে এমন বিধি- নিষেধ নির্বাচনী আইনে নেই।

প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। এবারের বিধানসভার নির্বাচনে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা দেখে সত্যিই কী আপনাদের মনে হয়েছে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাংবাদিকদের আচরণে খুব একটা পার্থক্য আছে? কলকাতার দু’টি বিত্তবান, শক্তিমান, জনপ্রিয় বাংলা চ্যানেলে টানা একমাস সাক্ষাৎকার অথবা আলোচনাচক্রের আড়ালে যেভাবে দলীয় রাজনৈতিক প্রচার চালানো হয়েছে তাকে কিছুতেই ‘নিরপেক্ষ’ আখ্যা দেওয়া যায় না। একটি চ্যানেল যদি দিনে দশ ঘণ্টা ধরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারের টেপ বিভিন্ন অছিলায় চালিয়েছে। তবে দ্বিতীয় একটি বামপন্থী টিভি চ্যানেলও এগারো ঘণ্টা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং গৌতম দেবের বিশেষ সাক্ষাৎকারের রাজনৈতিক বক্তব্য ক্রমাগত প্রচার করেছে। এই চ্যানেল দু’টি তথাকথিত নিরপেক্ষ প্যানেল ডিসকাশনের নামে যে রাজনৈতিক তর্ক বিতর্কের ‘লাইভ’ প্রচার করেছে তা যে নিতান্তই একপেশে সে কথা দর্শকরা আলোচনার শুরুতেই বুঝে গেছেন। চ্যানেল কর্তাদের জেনে রাখা ভাল যে কট্টর দলীয় সমর্থক ছাড়া সাধারণ দর্শকরা ওইসব ‘প্যানেল আলোচনা’ সম্প্রচার দেখলেও তার ফলে প্রভাবিত হননি। দর্শকরা নিছকই মজা পেতে প্যানেলের বক্তাদের তরজা দেখেছেন, শুনেছেন এবং পরে ভুলেও গেছেন। এবারের বিধানসভার নির্বাচনের প্রচারে যদি সত্যিই কেউ লাভবান হয় তবে তা মিডিয়া। তা’ সে টিভি চ্যানেলই হোক অথবা সংবাদপত্র। সংবাদ প্রচারের আড়ালে দলীয় প্রচার চালিয়ে সংবাদমাধ্যমের পরিচালকরা যুযুধান দুই জোটের কাছ থেকে কয়েক শত কোটি টাকা আয় করেছে। হ্যাঁ, একেই বলা হয় ‘পেড নিউজ’। কথাটা আমি বলছি না। প্রেস কাউন্সিল এবং নির্বাচন কমিশন উভয়েই বলেছে সংবাদ প্রচারের ‘ছদ্ম’ আড়ালে বিশেষ রাজনৈতিক দলের বা জোটের বক্তব্য তুলে ধরলে ধরে নেওয়া হবে সেটি আদতে ‘পেড নিউজ’। কারণ, বিনা ব্যবসায়িক স্বার্থে সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেল তা প্রচার করবে কেন? আপনারা গত ছয় দফা নির্বাচন চলাকালে বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং চ্যানেলে যে সব রাজনৈতিক বক্তব্য পড়েছেন অথবা দেখেছেন, শুনেছেন তার ৭০ শতাংশই ‘প্লানটেড নিউজ’। সাংবাদিকরাই নিজেদের মধ্যে আলোচনায় যাকে খাওয়ানো খবর বলে বিদ্রূপ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম ভোটের লড়াইতে ‘ম্যান অব দ্য সিরিজ’ বলা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কঠোর হাতে নির্বাচন পরিচালনা করায় ভোটে কারচুপি কোনও পক্ষই তেমনভাবে করতে পারেনি। যা’ অতীতে এই রাজ্যে ভাবাই যেত না। তবে ‘‘ম্যান অব দ্য সিরিজ’’ যদি নির্বাচন কমিশন হয় তবে ‘‘ভিলেন অব দ্য সিরিজ’’ হচ্ছে রাজ্যের সংবাদমাধ্যম। অর্থ লোভে পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় প্রভাবশালী সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেল সাংবাদিকতার নীতি, আদর্শ, বিশ্বাসযোগ্যতা সবই অকাতরে বিসর্জন দিয়েছে। তা’ না হলে রাজ্যের একটি বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী করে তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ও মন্ত্রক ‘স্কুপ নিউজ’ করে ছাপা হয় কেন? ওই সংবাদটি এতটাই ন্যক্কারজনক যে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তার নিন্দা করতে হয়েছে। ভুলে যাবেন না, মমতার তথাকথিত মন্ত্রিসভার খবরটি যখন সর্বাধিক প্রচারিত খবরের কাগজটিতে ছাপা হয় তখন নির্বাচনের ছয় দফা পর্ব শেষ হয়নি। তাই এমন খবর প্রকাশ করা নির্বাচনের আইনে মানা আছে। এখন দেখার যে নির্বাচন কমিশন এই সংবাদপত্রটির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়। তবে বিশেষ কোনও শাস্তি যে হবে না সে কথা আগাম বলে দেওয়া যায়। কারণ, নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল এবং রাজ্য প্রশাসনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেভাবে সংবাদমাধ্যমকে শাসন করে না। তার প্রমাণ, ভোটের প্রচার শেষ হলেও টিভিতে দলীয় বিজ্ঞাপন ও আলোচনার নামে দলীয় প্রচার এবার যেভাবে চলেছিল তা অতীতে কখনও হয়নি।

কিস্‌সা কুর্সিকা

নিশাকর সোম

এই কলম যখন লিখছি তখন এ-রাজ্যের চতুর্থ দফার ভোট শেষ হলো। ৬৩টি কেন্দ্রে ভোট হয়েছে। ২০০৬ সালের নির্বাচনের তুলনায় ভোট বেড়েছে হাওড়া---৭৬.৭৪ শতাংশ থেকে ৮০.২৬ শতাংশ, হুগলি---৮১.৭১ থেকে ৮৩.১২, বর্ধমান—৮৫.৬৬ থেকে ৮৮.৩২, পূর্ব মেদিনীপুর—৮৯.৬৫ থেকে ৮৯.৫৫ শতাংশ। এই চিত্রটি দেখলে বোঝা যাবে যে, ভোটের হার তেমন বাড়েনি, বরঞ্চ পূর্ব-মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে তা কমে গেছে। যদিও সিপিএম-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক তথা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেছেন যে ১১১টি বুথে তাঁদের দলীয় পোলিং এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয়নি। শাসক দলের এই কান্না অভিনব। এত বছর ধরে তাঁরা যে কায়দা-কানুন করেছিলেন, তা চক্রবৃদ্ধিহারে ব্যুমেরাং হচ্ছে। চতুর্থ দফার ভোটে পূর্ব-মেদিনীপুরে একটিও কেন্দ্রে জেতার সম্ভাবনা নেই সিপিএম তথা বামফ্রন্টের। উল্লেখ্য, চতুর্থ দফার নির্বাচনে বিশেষ করে পূর্ব-মেদিনীপুরের নির্বাচন-এর ব্যবস্থার প্রশংসা করে বামফ্রন্টের বিদায়ী মন্ত্রী কিরণময় নন্দ নির্বাচনী আধিকারিককে ফোনে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই কিরণময় নন্দই বলেছিলেন, ‘বামফ্রন্টের মৃত্যু হয়েছে। ডেথ সার্টিফিকেটটা ভোটের মাধ্যমে জনগণ দেবে’। বামফ্রন্ট উল্টে গেলে কিরণময়বাবুও উল্টে যাবেন কি?

হুগলি জেলাতে সিপিএম-এর পর্যুদস্ত হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। এমনকী জাঙ্গিপাড়ায় মন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরীর পরাজয়ের আশঙ্কা বাতিল করা যায় না। হাওড়ায় সিপিএম নেতৃত্ব আপ্রাণ চেষ্টা করে ৫০ শতাংশ আসন দখলে রাখার চেষ্টা চালিয়েছে। বালিতে সিপিএম নন্দীগ্রামের পাল্টা কৌশল নিয়েছে। বালিতে তৃণমূলপ্রার্থী প্রাক্তন পুলিশকর্তাকে সিপিএম বিব্রত করেছে, কারণ তৃণমূলের কর্মীগণ ব্রজমোহন মজুমদারকে জেতানোর জন্য চলে গিয়েছিলেন।

সিপিএম সংগঠনের এখন এমন বেহাল অবস্থা যে সব বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারছে না। দমদমে নাকি দুপুরের মধ্যেই সিপিএম-কর্মীরা বাড়ি চলে গেছলেন। এদিকে গৌতম দেব-এর দূরদর্শনে বারংবার বক্তব্য রাখাকে ব্যঙ্গ করে তৃণমূলের অঘোষিত দৈনিকে কার্টুন-এ লেখা হয়েছে—‘এবার গৌতম দেবের সিরিয়াল’...। এই কার্টুনিস্ট যুগান্তর পত্রিকার প্রাক্তন কার্টুনিস্ট—যিনি নিজেকে ‘সিপিএম সমর্থক’ বলে দাবি করেন। তিনি গৌতমবাবুর একঘেয়েমি কথা শুনে বিরক্ত বোধ করেছেন। ইভিএম মেশিনে কারচুপি করা যায়---এই অভিযোগ নিয়ে সিপিএম-এর প্রাক্তন সাংসদ মহঃ সেলিম নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে অভিযোগ পেশ করেছেন। তিনি পার্টির বাঁকুড়া জেলার পার্টি-সম্পাদক অমিয় পাত্রের নিকট ইভিএম হ্যাক করার জন্য এস এম এস মারফত প্রস্তাব দিয়েছিল কেউ একজন—এই অভিযোগও সেলিম করেছেন।

সিপিএম সংগঠনের এখন এমন বেহাল অবস্থা যে সব বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারছে না। দমদমে নাকি দুপুরের মধ্যেই সিপিএম-কর্মীরা বাড়ি চলে গেছলেন। এদিকে গৌতম দেব-এর দূরদর্শনে বারংবার বক্তব্য রাখাকে ব্যঙ্গ করে তৃণমূলের অঘোষিত দৈনিকে কার্টুন-এ লেখা হয়েছে—‘এবার গৌতম দেবের সিরিয়াল’...।

এদিকে ভোটের ফলাফল নিয়ে দুই যুযুধান পক্ষ সংখ্যার লড়াইয়ে নেমেছেন। তৃণমূল সূত্র বলছে তাঁরা ২০০টি কেন্দ্রে জয়ী হবে। বামফ্রন্ট ৬৫ পাবে। অন্যদিকে সিপিএম নেতা ও বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু স্বচ্ছন্দ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের কথা বলছেন। এদিকে বিদায়ী মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন—বামফ্রন্ট ১৩০টি সীট পাবে। সবই স্পেকুলেটিভ। বামফ্রন্টের বিভিন্ন সূত্রে ১৫০/১৫১/১৬৮/১৬৪ আসন পাওয়া দাবি করা হচ্ছে। সিপিএম সূত্রে এও বলা হচ্ছে, ১০ জন মন্ত্রী পরাজিত হবেন।

শেষ করার আগে আবার বলছি, আগে যাঁরা ভোট দিতে পারতেন না—তারা ব্যাপকভাবে সিপিএম-বিরোধী ভোট দেবেন বলে মনে করা যায়। ১৩ মে তারিখেই সত্য বোঝা যাবে।

প্রচারের মধ্যে কতকগুলি কথা দেখা গেছে—যেমন অনিল বসু, সুশান্ত ঘোষ প্রমুখ সিপিএম নেতারা কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করেছেন।

আবার তৃণমূলের পক্ষ থেকেও কিছু অশালীন মন্তব্য শোনা গেছে। বিশেষ করে ২২ এপ্রিলে তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসু বলেছেন---‘‘মমতার চটি দিয়ে গৌতমের গালে মারা হবে, তার চশমা-টসমা ভেঙে যাবে।’’

গৌতম দেব বলেছেন—‘‘নির্বাচনের পর বুদ্ধদা-কে বলবো মমতা-কে অতিরিক্ত রক্ষী দিতে।’’ ১৩ মে-র পর প্রবল হাঙ্গামা হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে দুই যুযুধান গোষ্ঠী।

এই সময়

অবশেষে চার্জশিট

অবশেষে গত ৬ মে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট চার্জশিট পেশ করলো বহু কোটি টাকা আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পুণের ব্যবসায়ী হাসান আলি খানের বিপক্ষে। সেইসঙ্গে হাসানের অতি-ঘনিষ্ঠ কলকাতার ব্যবসায়ী কাশীনাথ তাপুরিয়ার বিরুদ্ধেও পেশ হলো চার্জশিট। প্রসঙ্গত, সুইস ব্যাঙ্কে হাসানের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৩৭,৫০০ কোটি টাকা। কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে আয়কর দপ্তর তার নামে ৫০,০০০ কোটি টাকা ফাইন করে দেয়। অভিযোগ ওঠার পর বহুদিন কেন্দ্রীয় সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে থাকায় সংসদে বিরোধীদের প্রশ্নবাণে তিতিবিরক্ত অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের এর সম্বন্ধে ক্ষিপ্ত মন্তব্য ছিল কেউ কর ফাঁকি দিলে তাকে তো আর ফাঁসি দেওয়া যায় না। এহেন পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে জনৈক রসিকের মন্তব্য—চার্জশিটেই হাসান-কাণ্ডের ইতি ঘটলো বলে! কেন্দ্রীয় সরকারের অমন শুভ্যানুধায়ীকে চার্জশিট, এতো ফাঁসিরই সামিল!

মাথা-ব্যথা

আপনার কি যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে? নাকি থেকে থেকে মাথা ধরছে। সোজা চলে যান বাবা রামদেবের কাছে। মাথা-ব্যথা কিংবা মাথা-যন্ত্রণা উপশমের অব্যর্থ ওষুধ পেয়ে যাবেন। তবে বাবা রামদেবই আপাতত মাথা- ব্যথার কারণ। কার আবার? কেন—কেন্দ্রের! কালো টাকা আর আর্থিক দুর্নীতি'র প্রতিবাদে আগেই ময়দানে নামার কথা ঘোষণা করায় থরহরি কম্পমান হয়েছিল কেন্দ্র। সম্প্রতি তিনি জানিয়ে দিলেন, এই আন্দোলন রাজনীতি বহির্ভূত হলেও রাজনীতি জগতের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিজেপি-র প্রাক্তন থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক গোবিন্দাচার্য এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এস গুরুমূর্তি-র সঙ্গে যৌথভাবে আন্দোলনে যাচ্ছেন তিনি। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে, দেশের মানুষ জানেন, কারা (পড়ুন গোবিন্দাচার্য ও গুরুমূর্তি) তাঁদের সঙ্গে আর্থিক-দুর্নীতির প্রশ্নে একমত। সেই কারণেই এই দু'জনের সঙ্গে আন্দোলনে যেতে যান বলে জানিয়েছেন যোগগুরু বাবা রামদেব। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই, সংগঠন প্লাস নেতা প্লাস ব্যক্তিত্ব। এই মাহেন্দ্রযোগ কেন্দ্রের সইবে তো?

সেলাম আদালত

লক্ষ্ণৌ উচ্চ-আদালতের এই রায় নিঃসন্দেহে উত্তর-প্রদেশ তো বটেই, এমনকী সারা ভারতের মানুষকেও দেশের আদালতী-ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলবে। ২০০৮-এর ২৪ ডিসেম্বর আয়ুরিয়ায় রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মনোজ গুপ্তাকে হত্যার দায়ে সেরাজ্যের শাসক দল বহুজন সমাজ পার্টির আয়ুরিয়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধায়ক শেখর তিওয়ারীসহ নয় অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিল লক্ষ্ণৌ হাইকোর্ট। সেইসঙ্গে তাদের ৬৮ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। শেখর তিওয়ারীর স্ত্রী, মনোজ গুপ্তা হত্যা মামলায় অন্যতম অভিযুক্তা বিভা তিওয়ারীকেও আড়াই বছরের কারাবাস ও সাড়ে চার হাজার টাকা জরিমানা করেছে উচ্চ-আদালত।

প্রচ্ছন্ন হুমকি

হুমকি দিতে জানেন বটে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কেজি বালাকৃষ্ণণ! আয়কর দপ্তর ইতিপূর্বে অভিযোগ তুলেছিল, বালাকৃষ্ণণের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের প্রচুর কালো টাকা রয়েছে। সম্প্রতি এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আয়কর দপ্তরকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বালাকৃষ্ণণ বলেছেন, 'আমার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী লবি কাজ করছে। কিন্তু এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমি কোনওরকম দলিত তাস খেলব না।' প্রাক্তন প্রধানবিচারপতির মন্তব্যে প্রচ্ছন্ন হুমকি'র গন্ধ পাচ্ছেন অনেকেই। প্রশ্ন উঠছে, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি'র তো দেশের গণতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত। সেখানে দলিত তাস খেলার প্রশ্ন ওঠেই বা কি করে? তবে কি 'দলিত তাস' খেলব না বলে, প্রচ্ছন্নভাবে আগামী দিনে দলিত তাস খেলার এক প্রকার হুমকি-ই দিয়ে রাখলেন তিনি? যাই হোক না কেন, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্য দেশের গণতন্ত্রের কাছে কিন্তু অশনি সংকেতই বয়ে আনছে।

গ্লোবাল ঢপবাজি

বলতে পারেন এই ভরা গ্রীষ্মে 'লু' বইছে না কেন? কেনই বা সন্ধ্যের দিকে আকাশে মেঘের অকারণ আনাগোনা? একি চটে যাচ্ছেন কেন? কি বলছেন—গরমে ঘেমে-নেয়ে একসা হয়ে বিনিদ্র রজনী কাটাতে বেশ ভাললাগে বুঝি? আরে রামো! রাতের দিকে বৃষ্টি হয়ে ঠাণ্ডা হলে কার না ভাল লাগে! তবে কি না আবহবিদেরা বেজায় শঙ্কিত হয়ে বলছেন—গরম কালেও জ্যৈষ্ঠের তাপপ্রবাহহীনতায় নাকি ক্ষতি হচ্ছে বর্ষারই। অর্থাৎ কালবৈশাখী বলা চলে না কিন্তু সন্ধ্যের দিকে মেঘের আনাগোনা কাঁটা বিছিয়ে দিচ্ছে সঠিক সময়ে বর্ষার আগমনে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকৃতির এই খামখেয়ালীপনা নাকি গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্যই। যদিও সাধারণে তা মানতে নারাজ। তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, গরমকালে যদি গরমই না পড়ল সেভাবে, তবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হলোটাই বা কি করে? প্রকৃতির খামখেয়ালীপনাকেই কি তবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং (বিশ্ব উষ্ণায়ন) বলে চিহ্নিত করছেন আবহবিদেরা? এক ছাত্রের রসিকতা—গ্লোবাল ওয়ার্মিং, না গ্লোবাল ঢপবাজি ঠিক কোনটা চলছে বলুন তো!

মঙ্গলনিধি

বিদ্যার্থী পরিষদের প্রদেশ কর্মসমিতির সদস্য তথা আগরপাড়ার স্বয়ংসেবক চণ্ডীচরণ রায় তাঁর বিবাহ উপলক্ষে গত ২৯ এপ্রিল প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক শ্রী কেশবরাও দীক্ষিতের হাতে মঙ্গলনিধি সমর্পণ করেন। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, সেবা প্রমুখ বুদ্ধদেব মণ্ডল, ব্যারাকপুর জেলা কার্যবাহ কাজল সিকদার প্রমুখ।

***

গত ২৫ এপ্রিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাঁকুড়া জেলা সহসম্পাদক আমোদ কুমার বাউড়ির বোন মামনি-র বিবাহ উপলক্ষে তাঁর বাবা ও মা কার্তিক বাউড়ি ও বেলা বাউড়ি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাদেশিক সহ-সেবা প্রমুখ অর্চনা সাহার হাতে ৩০১ টাকা মঙ্গলনিধি হিসেবে প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আর এস এসের বাঁকুড়া বিভাগ প্রচারক রামপ্রসাদ নন্দী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শোক সংবাদ

সঙ্ঘের কাটোয়া জেলার কারুলিয়া গ্রামের স্বয়ংসেবক শ্রী দেবাশীষ বন্ধুর পিতৃদেব গণপতি বন্ধু গত ২০ মার্চ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। দুই পুত্র এক কন্যাসহ তাঁর নাতি নাতনিরা বর্তমান।

***

গত ২০ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জলপাইগুড়ি জেলা সঙ্ঘচালক প্রদীপ ঝা চক্রবর্তীর মা বেলা রাণী দেবী ৯২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি তিন পুত্র, এক কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে গিয়েছেন।

সেবানিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া জেলার বড়েয়া গ্রাম শাখার স্বয়ংসেবক নবীন চক্রবর্তী ও প্রবীণ চক্রবর্তী তাদের মাতৃদেবী ডলি চক্রবর্তীর আত্মার শান্তি কামনায় ৫০০১ টাকা সেবা কাজের জন্য প্রদান করেন। প্রয়াত চক্রবর্তীর স্বামী নৃসিংহ চক্রবর্তী সঙ্ঘের পুরাতন কার্যকর্তা।

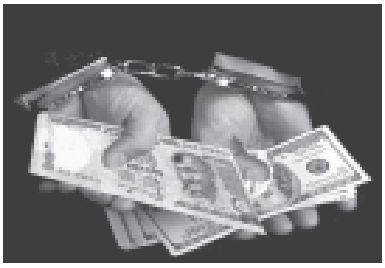

দুর্নীতির কেন্দ্র, কেন্দ্রের দুর্নীতি

তারক সাহা

স্বাধীনোত্তর ভারতে বহু দুর্নীতি হয়েছে কেন্দ্র অথবা বিভিন্ন রাজ্য স্তরে। এর মধ্যে সর্ববৃহৎ দুর্নীতি ঘটেছে ইউ পি এ সরকারের আমলে। সি এ জি-র রিপোর্ট বলছে, ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার নয়-ছয়ের কথা। ২জি কেলেঙ্কারির মতো এত বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি এযাবৎ দেশে ঘটেনি। বিগত বছরগুলিতে দেশে যত কেলেঙ্কারি ঘটেছে তা বিভিন্ন তদন্ত কমিশনের আওতায় এনে ধামাচাপা দেবার দস্তুর সব রাজনৈতিক দলেরই কমবেশি আছে। এই সমস্ত কমিশনগুলির তদন্তের আওতায় কেলেঙ্কারিগুলিকে এনে আমজনতার দৃষ্টিকে অন্যত্র ঘুরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরেই চলেছে। সুতরাং এবারেও তার অন্যথা হয়নি।

এত বড় মাপের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছেন দেশের তাবড় নেতারা। জড়িয়ে পড়েছেন বড় বড় কর্পোরেট সংস্থার কর্ণধাররা। আর এই কেলেঙ্কারির নজরদারি করছে স্বয়ং সুপ্রীম কোর্ট। বিরোধীরা জেপিসি-র তদন্ত নিয়ে গোটা শীতকালীন সংসদের অধিবেশন চলতে দেয়নি। নিন্দুকেরা বলছে এতে ২০০ কোটি টাকার ওপর ক্ষতি হয়েছে দেশের। সে যাই হোক, জেপিসি নয়, বরং পি এ সি-কে দিয়ে তদন্ত করানোর সিদ্ধান্তে অনড় ছিল মনমোহন সিং নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার এবং কংগ্রেস দল। শেষপর্যন্ত অবশ্য বিরোধীদের চাপে তারা মাথানত করেছে। পি এ সি তদন্তও চলেছে, সেই সঙ্গে জেপিসি-র তদন্ত চলছে যার রিপোর্ট সংসদের বাদল অধিবেশনে জমা পড়ার কথা।

আসলে এসব হলো পুরাতন ঘটনার

দুর্নীতিটা হয়েছে কেন্দ্রে এবং স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্র জড়িয়ে রয়েছে আগাপাশতলা এই দুর্নীতিতে। পি এ সি-কে গালমন্দ করে কংগ্রেস সাময়িক স্বস্তি পেলেও আগামী দিনে জেপিসি-র রিপোর্টে বা সুপ্রীম কোর্টের বক্তব্যে যদি মনমোহন জড়িয়ে পড়েন তখন কি কংগ্রেস বিচার বিভাগের অতি সক্রিয়তার কথা বলে হাওয়া ঘুরিয়ে দিতে চাইবে!

আসলে দেশে দুর্নীতির জন্মদাতা কংগ্রেস। জওহরলাল নেহরু থেকে ইন্দিরা, নরসিংহ রাও হয়ে মনমোহন পর্যন্ত সব প্রধানমন্ত্রীই প্রত্যক্ষ পরোক্ষে কোনও না কোনও দুর্নীতিতে অভিযুক্ত।

পুনরাবৃত্তি। ঘটনা হলো পি এ সি রিপোর্ট নিয়ে কংগ্রেসের হৈচৈ। বর্তমান পি এ সি-র মেয়াদকাল শেষ হয়েছে ৩০ এপ্রিল। সুতরাং স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির তদন্তের রিপোর্ট নীতিগতভাবে বিদায়ী পি এ সি-র জমা দেওয়ার কথা মেয়াদকাল শেষ হওয়ার আগেই। যেহেতু এটা সংসদীয় কমিটি, সুতরাং রিপোর্টটি জমা দেওয়ার দায়িত্ব বিদায়ী চেয়ারম্যানের। যেহেতু সংসদে এখন কোনও অধিবেশন চলছে না, তাই এটি জমা পড়বে লোকসভার অধ্যক্ষা তথা স্পীকারের কাছে। ইতিমধ্যে নিয়ম মেনে তা জমাও পড়েছে।

বিষয়টা এখানেই শেষ নয়। পি এ সি তার রিপোর্টে ২-জি মামলায় প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে দুষেছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর দপ্তরকে। স্পেকট্রাম মামলায় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমও তাঁর দায় এড়াতে পারেন না— এমন কথা পি এ সি-র রিপোর্টে বলা হয়েছে। এতেই বেজায় চটেছে কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, মনমোহনের মতো এক নির্ভেজাল সৎ মানুষের নামে বদনাম! রে-রে করে তেড়ে এলো কংগ্রেস। অথচ এই দলই আগে পি এ সি তদন্তের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছে।

এতে কংগ্রেসের সততা রইল কোথায়? রাজা যিনি এখন জেল খাটছেন, তিনি তো প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিসভার এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আর তাঁর অপকর্মের দায় কি মনমোহন সরাসরি এড়াতে পারেন? আইনের ভাষায় একে "Vicarious liability" বলা হয়। এই তত্ত্বে কোনও ভৃত্য যদি অপরাধ করে তো তাতে মনিবের নাম জড়িয়ে পড়ে। যদিও সেই মনিব ভৃত্যের অপকর্মের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে কোনওভাবেই জড়িত নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দেশের কোথাও যদি বড়সড় রেল দুর্ঘটনা ঘটে, তবে তার দায় রেলমন্ত্রীর ঘাড়েই বর্তায়। এদেশে এমন নজিরও আছে যে রেল দুর্ঘটনার দায় নিয়ে তৎকালীন রেলমন্ত্রী ললিতমোহন মিশ্র পদত্যাগ করেছেন। ওই দুর্ঘটনায় কিন্তু রেলমন্ত্রী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে যুক্ত ছিলেন না। তবু একটা নৈতিক দায় তো থাকেই। আজকাল অবশ্য নৈতিকতার কোনও বালাই নেই। সুতরাং রাজা ২-জি স্পেকট্রামের যে সব বরাত কর্পোরেট সংস্থাকে পাইয়ে দিয়েছিলেন তা কি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বা অর্থ দপ্তরের অজান্তেই? এমনটা বিশ্বাস করা কঠিন। একটা যৌথ দায়িত্ব তো থেকেই যায়, কেননা পুরো ক্যাবিনেটই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন।

অথচ গত ১১ ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশনে এই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন— "I have nothing to hide from the public and as a proof of my bonafides, I intend to write to the Chairman, PAC, that I shall be happy to appear before it chooses to ask me to do so"। আবার ২০১১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি বললেন, পি এ সি এক যৌথ সংসদীয় কমিটি, যার নেতৃত্বে রয়েছেন এক অভিজ্ঞ বিরোধী সাংসদ এবং সেখানে আমি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। একই সুরে মন্ত্রীসভায় দু'নম্বর ব্যক্তিত্ব প্রণববাবুও পি এ সি-র সমর্থনে কথা বলেছেন। তাই প্রশ্ন হলো, এত সবের পরেও মনমোহন সিং বা চিদাম্বরমের নাম জড়িয়ে পি এ সি যে রিপোর্ট জমা দিল তাতে দল কেন এত অখুশি? আইনকে যদি নিজের পথে চলে বা চলতে দেওয়া হয়, তাহলে জেপিসি-র রিপোর্টেও তো প্রধানমন্ত্রী বা তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে যায়। তাহলে তখন কংগ্রেসের অবস্থান কোথায় হবে— এই প্রশ্ন সকলেরই।

সাফ কথা দুর্নীতিটা হয়েছে কেন্দ্রে এবং স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্র জড়িয়ে রয়েছে আগাপাশতলা এই দুর্নীতিতে। পি এ সি-কে গালমন্দ করে কংগ্রেস সাময়িক স্বস্তি পেলেও আগামী দিনে জেপিসি-র রিপোর্টে বা সুপ্রীম কোর্টের বক্তব্যে যদি মনমোহন জড়িয়ে পড়েন তখন কি কংগ্রেস বিচার বিভাগের অতি সক্রিয়তার কথা বলে হাওয়া ঘুরিয়ে দিতে চাইবে!

আসলে দেশে দুর্নীতির জন্মদাতা কংগ্রেস। জওহরলাল নেহরু থেকে ইন্দিরা, নরসিংহ রাও হয়ে মনমোহন পর্যন্ত সব প্রধানমন্ত্রীই প্রত্যক্ষ পরোক্ষে কোনও না কোনও দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। একুশ সদস্যের পি এ সি-র বর্তমান রিপোর্টে স্বাক্ষর করেছেন ৯ সদস্য। বিরোধিতায় ১১ সদস্য। সুতরাং ভোটাভুটিতে খারিজ হয়ে গেলেও প্রশ্ন থেকে যাবে রাজ্যে যুযুধান দুই দল বসপা আর সপাকে কী জাদু বলে কংগ্রেস এককাট্টা করল পি এ সি-র দুই দলকে? এবারও সেই অনিয়ম, অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়েছে কংগ্রেস। অতীতে ইউ পি এ- ১ সরকারকে বাঁচিয়েছে সপা, সিপিএম আনীত অনাস্থা প্রস্তাবে। রাজ্যে যুযুধান হলেও দুর্নীতির বিষয়ে দু-দলই সমগোত্রীয়। সম্প্রতি বি এস পি-কে অস্বস্তিতে ফেলে রাহুল গান্ধীর এক আবেদনে স্বাস্থ্য দপ্তরে অনিয়ম ঢাকতে যে দুই মেডিকেল অফিসার খুন হয়েছেন তার তদন্তের কথা বলা হয়েছে। সুত্রের মতে, পি এ সি-র বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার বিনিময়ে মায়াবতীকে রেহাই দিতে আশ্বাস দিয়েছে কংগ্রেস।

কাজেই পি এ সি-র মতো জে পি সি-র রিপোর্টও ভেস্তে না যায় কংগ্রেসের এই অনৈতিকতার ফাঁদে। এক দুর্নীতিকে চাপা দিতে আরেক দুর্নীতিকে আনা হচ্ছে অনৈতিক উপায়ে। তাহলে এই দুর্নিবার দুর্নীতির রক্ষাকবচ কে? প্রশ্নটা ঝুলেই রইল।

ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চাই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

অতিথি কলম

প্রফুল্ল গোরাডিয়া

জওহরলাল নেহরু সেই ১৯৫৬ সালে পার্লামেন্টে অভিন্ন সিভিল কোড রাখার পক্ষে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা আজও সরকারী নীতি। তিনি বলেছিলেন, ''আমি চাই অভিন্ন সিভিল কোড, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'প্রজ্ঞা'। যদি কেউ অভিন্ন সিভিল কোড বিল পার্লামেন্টে পেশ করেন তাহলে আমি অবশ্যই সম্মতি জানাব।'' এ বছরের ৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়টিই মনে করিয়ে দিয়েছেন।

নেহরু যে প্রজ্ঞার কথা বলেছিলেন সেটিকে সাহসের অভাব বলাই ভাল। নেহরুর মৃত্যুর পর ৪৭ বছর হয়ে গেল কেউই এ বিষয়ে সাহস দেখালেন না। গোয়া, দমন, দিউতে অভিন্ন পারিবারিক আইন আছে, যেটি এম এস উসগাঁওকার প্রণীত এবিষয়ে দু খণ্ড গ্রন্থে আছে। এই অভিন্ন পারিবারিক আইন ১৮৬৭ সালে পর্তুগীজ সরকারের সময়ে গ্রন্থিত হয়। এই আইনটি কোড নেপোলীয়নের উপর ভিত্তি করে প্রণীত, যা পর্তুগালেও বহাল আছে।

১৯৭৯ সালে প্রধান বিচারপতি ওয়াই বি চন্দ্রচূড় একটি সম্মেলন উদঘাটন করেন। সেই সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে এই আইন আগের মতো এখনও গোয়া, দমন, দিউতে লাগু থাকবে। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বোম্বে হাইকোর্টের জি এফ কৌটো বলেন, এটা খুব গর্বের বিষয় যে এই ইউনিয়ন টেরিটোরিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (কমন সিভিল কোড) সংক্রান্ত ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ ধারা কার্যকর রয়েছে। বিচারক জোর দিয়ে আরও বলেন যে অভিন্ন সিভিল কোড জাতীয় সংহতির পক্ষে অপরিহার্য। তাহলে প্রশ্ন হলো গোয়া, দমন, দিউর মুসলমানেরা যদি অভিন্ন সিভিল কোড মেনে চলতে পারে তবে সারা দেশে তারা পারবে না কেন? তবে কি ধরে নেব যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য না দিয়ে মৌলানাদের সন্তুষ্ট করতে চাইছেন? সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সাথে মুসলিমদের চিন্তাধারার অনৈক্যের একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক জানিয়েছেন যে হজ বিষয়ে অর্থানুকূল্য অইসলামিক। অল ইন্ডিয়া মুসোওয়ারত মনে করেছেন যে এটি ধীরে ধীরে তুলে দিতে হবে। কিন্তু কোর্ট মনে করেন নেহরু প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারত নির্মাণে এটি একান্ত দরকার।

প্রধান বিচারপতি এম উ বেগ তাঁর 'ইম্প্যাক্ট অফ সিকুলারিজম অন লাইফ এন্ড ল' গ্রন্থে লিখেছেন যে পার্সোনাল ল'র অন্তর্ভুক্ত বিবাহ ও সাকসেশন সংক্রান্ত বিষয় ধর্মের আওতায় পড়ে না। হিন্দু ও শিখের পক্ষে সাকসেশান আইন একরকম হবে আর মুসলিমদের বেলায় অন্যরকম—এ কেমন যুক্তি? এর মানে কি এটা দাঁড়ায় না যে শরিয়ত নিয়ে মাতামাতি করার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত আইন বাঁচিয়ে রাখা আর অখণ্ড সিভিল ল'র বিরোধিতা করা? ঘটনা হলো খুব কম মুসলমানই একটার বেশি স্ত্রী রাখেন। বহুবিবাহর ভয় সর্বদা মেয়েদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তিন তালাকের জোরে স্বামীরা আবার বিয়ে করতে পারবে এই আশংকায় মেয়েরা স্বামীকে সবসময় খুশী রাখতে ব্যাকুল। বিচারপতি এম সি চাগলা মনে করতেন বহুবিবাহপ্রথা নারীত্বের পক্ষে অবমাননাকর। তাছাড়া এই প্রথা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। ইরান, ইজিপ্ট, মরোক্কো, টিউনিসিয়া, এমনকী পাকিস্তানও বহুবিবাহপ্রথা বিলোপ করেছে। অরুণা আসফ আলি তাঁর 'রিসার্জেন্স অফ ইন্ডিয়ান উওমেন' গ্রন্থে লিখেছেন, রাজনৈতিক দলগুলি পুরোহিত শ্রেণীর মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতে চান এবং এই সুবিধাবাদীশ্রেণীর উদ্দেশ্য হলো অন্যদের পিছিয়ে রাখা। তাঁর মতে মহম্মদ তিন তালাক কখনও সমর্থন করেননি।

তা সত্ত্বেও ন্যাশনাল মাইনরিটিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাহির মাহমুদ ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ ধারা যেটি ইউনিফর্ম সিভিল কোডের কথা বলেছে সেটির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর বক্তব্য সমর্থন করে এম পি রাজু তাঁর 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড—এ মিরাজ' গ্রন্থে যা বলেছেন তা হলো এই ধারা অনিচ্ছুক মুসলিমদের উপর অইসালামিক আইন ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া।

আরও একটা যুক্তি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠদের পুরাণ সংখ্যালঘুদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। কিন্তু অধ্যাপক মাহমুদ ইচ্ছাকৃতভাবে যেটা এড়িয়ে গেছেন সেটা হলো যে আইন বর্তমানে ভারতে চালু আছে তা বৃটিশদের তৈরি যাকে তিনি হিন্দু পুরাণ বলছেন।

যদি তর্কের খাতিরে তাঁর যুক্তি মেনে নিই তাহলে তাঁর কাছে প্রশ্ন তিনি IPC ও CrPC ধারা চুপচাপ মেনে নিচ্ছেন কেন? কোনও মুসলিম চোরের হাত কেটে নেওয়া হয়েছে কি? কুসীদবৃত্তি কোরাণে হারাম। কিন্তু কোনও কাবুলী কুসীদজীবী বা দক্ষিণ গুজরাটের তুর্কাদাসদের তো ইসলামধর্মচ্যুত করা হয়নি। অধ্যাপক মাহমুদ মনে হয় মেয়েদের মুসলিম মনে করেন না। সেই কথা ভেবে বুঝি শাবানা আজমি মুসলিম মেয়েদের অবিচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের পক্ষে ওকালতি করেছেন।

এই মত প্রায় একশ বছর আগে ব্যক্ত করেছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক খুদা বক্স যাঁর নামে পাটনায় খুদা বক্স লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য—বহুবিবাহ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মত থাকতে পারে না। তিনি ইসলামের বহুবিবাহ প্রথা সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন ছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি কবি মহম্মদ ইকবালের সঙ্গে একমত ছিলেন যিনি মেয়েদের আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে পূর্ববঙ্গে তালাক যেন জল ভাত। বউদের পুরনো কাপড়ের মতো যখন খুশী ত্যাগ করা হয়। এসবের জন্যে কোনও আইনী অনুসন্ধান বা সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইকবাল আরও বলেছিলেন যে স্বামীদের দয়া-দাক্ষিণ্যের হাত থেকে বাঁচার মেয়েদের একমাত্র পথ হলো ধর্ম ত্যাগ। (মারে টিটাস লিখিত ইন্ডিয়ান ইসলাম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

প্রধান বিচারপতি এম উ বেগ তাঁর 'ইম্প্যাক্ট অফ সিকুলারিজম অন লাইফ এন্ড ল' গ্রন্থে লিখেছেন যে পার্সোনাল ল'র অন্তর্ভুক্ত বিবাহ ও সাকসেশন সংক্রান্ত বিষয় ধর্মের আওতায় পড়ে না। হিন্দু ও শিখের পক্ষে সাকসেশান আইন একরকম হবে আর মুসলিমদের বেলায় অন্যরকম—এ কেমন যুক্তি? এর মানে কি এটা দাঁড়ায় না যে শরিয়ত নিয়ে মাতামাতি করার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত আইন বাঁচিয়ে রাখা আর অখণ্ড সিভিল ল'র বিরোধিতা করা?

ক্যানসারের মতো ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে দুর্নীতি

মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলী (অব)

বেশ কিছুদিন যাবৎ আসমুদ্র হিমাচল উত্তাল হয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে হাজার হাজার কোটি টাকা ভ্রষ্টাচারের মাধ্যমে আত্মসাৎ করার সংবাদে। একদিকে 'টু-জি স্পেকট্রাম' কাণ্ডে এক লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকা সরকারের ক্ষতি হয়েছে। বড় বড় শিল্পপতিরা টেলিকম মন্ত্রী রাজাকে খুশী করে অবৈধভাবে অনুপযুক্ত শিল্পসংস্থার নামে স্পেকট্রাম কিনে নিতে সক্ষম হয়েছেন। সকলেই জানেন চাহিদার তুলনায় স্পেকট্রাম অনেকটাই কম। সেজন্যই স্পেকট্রাম দুর্মূল্য। অনেক অবৈধ শিল্পসংস্থা, যেমন যাদের মূল ব্যবসা জমি-জায়গা ইত্যাদি, রাজা সাহেবের দাক্ষিণ্যে স্পেকট্রাম পেয়ে তারা চড়াদামে অন্য সংস্থাকে বিক্রী করে মুনাফা লুটেছেন। মন্ত্রী রাজা এখন কারাগারে। আর একদিকে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার প্রধান সাংসদ সুরেশ কালমাদীর নেতৃত্বে সদ্যসমাপ্ত কমনওয়েলথ গেমসে শত শত কোটি টাকা লুটে নেওয়া হয়েছে। কালমাদীও এখন জেলে। এছাড়াও সুইজারল্যান্ড ও জার্মানীর ব্যাঙ্কে ভারতীয়রা প্রায় আট বিলিয়ন কালো টাকা অবৈধভাবে জমিয়ে রেখেছেন। আয়কর ফাঁকি দিয়ে এই অর্থ পাচার করা হয়েছে। অনেকের ধারণা এই টাকা ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদী এবং সমাজবিরোধীদের হাতেও চলে গিয়ে থাকতে পারে। জানা যায় জার্মানি থেকে ওই কালো টাকার মালিকদের নামের তালিকা ভারত সরকারের হাতে এসেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী সেই নামগুলি প্রকাশ্যে আনা যাবে না। এমনই বক্তব্য সরকারি মহলের। প্রকাশ করলে আর নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যাবে না। যদিও ভারত সরকার মাননীয় সুপ্রীম কোর্টে এই তালিকা জমা দিয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট ভারত সরকারের সমালোচনা করে জানিয়েছেন, কালো টাকা উদ্ধারে ভারত সরকার এত 'ধীরে চল' নীতি কেন গ্রহণ করছেন?

এতো গেল রাষ্ট্রের উচ্চতম মহলে ভ্রষ্টাচারের সর্বাধুনিক পরিস্থিতি। কিন্তু ভারতের সরকারি এবং বেসরকারি কর্মী মহলে এবং সমাজের প্রায় সর্বস্তরে ভ্রষ্টাচার এমন ভাবে বাসা বেঁধেছে, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ওষুধে ভেজাল, তেলে ভেজাল, মাছ, আলু বিক্রেতার বাটখারায় ভেজাল। ফুটপাথ হকারদের দখলে, পার্টীর দাদাদের হাত গরম করে দিলেই হলো। ''বসে যাও, কে তোলে দেখে নেব''। কিছু অর্থ ব্যয় করতে পারলে ভূয়ো জন্ম শংসাপত্র, বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র, জমির দলিলে কারচুপি, মিউটেশান ইত্যাদি করা সহজ ব্যাপার। আবার উৎকোচ দিতে অস্বীকার করলে এক সৈনিক ১৯৬৬-তে জমি কেনার পরও ২০১১-তে তার নামে মিউটেশন হয়নি। সমগ্র ভারতীয় সমাজ আজ এই ভ্রষ্টাচার ব্যাধিগ্রস্ত।

যারা সরকারী সুযোগ চায় তারা উৎকোচ দিতে আগ্রহী এবং সরকারি প্রশাসনের ন্যূনতম কর্মচারী থেকে উচ্চতম কর্মচারীদের বহুলাংশে উৎকোচ ছাড়া ফাইল নাড়াতে নারাজ। অর্থাৎ দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় সমাজের সর্বত্র এবং জাতীয় চরিত্রে ভ্রষ্টাচার ভীষণভাবে প্রভাব ফেলেছে।

পাঞ্জাবে কর্মে নিযুক্ত থাকার সময় একটি সামরিক হাসপাতালে পরিদর্শন করতে যাই। শিশুদের ওয়ার্ডে একটি মাত্র রুগী। বছর দশেকের একটি বালক, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র। বললাম, ''ভাল করে পড়াশোনা কর। তোমার পিতা হাবিলদার, তুমি এন ডি এ-তে যাবে অফিসার হবে।'' শিখ পরিবারের সন্তান, বলল, ''কখনই না। আমি পুলিশের হাবিলদার হতে চাই। আমাদের প্রতিবেশী, পুলিশের হাবিলদারের বাড়ীতে রঙ্গীন টিভি, মারুতি গাড়ী, বাইক, ট্রাক, অর্থ, প্রতিপত্তি কি নেই তাদের বাড়ীতে? আর আমার বাবা, বছরে একবার কিছুদিনের জন্য বাড়ী আসেন। আমাদের সংসার কোনওভাবে চলে। আমি ফৌজে যাব না।'' আমার সঙ্গে হাসপাতালের কম্যাডান্ট, মেট্রন ও অন্য চিকিৎসকরা ছিলেন। সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করলাম। প্রশ্ন থেকে যায় পুলিশের হাবিলদারের সেই জীবনমান নিশ্চয়ই তাঁর মাসিক বেতনের উপর সম্ভব হয়নি। একটি বালকেরও দৃষ্টিতে এই বিষয়টি এড়ায়নি। যারা সরকারী সুযোগ চায় তারা উৎকোচ দিতে আগ্রহী এবং সরকারি প্রশাসনের ন্যূনতম কর্মচারী থেকে উচ্চতম কর্মচারীদের বহুলাংশে উৎকোচ ছাড়া ফাইল নাড়াতে নারাজ। অর্থাৎ দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় সমাজের সর্বত্র এবং জাতীয় চরিত্রে ভ্রষ্টাচার ভীষণভাবে প্রভাব ফেলেছে।

বছর দুই আগে দক্ষিণবঙ্গে মথুরাপুরে

> **“আন্না হাজারের দেশব্যাপী আন্দোলন নিশ্চয়ই লোকপাল বিলকে মহাশক্তিশালী আইন হিসাবে প্রস্তুত করবে, কিন্তু যদি ওই লোকপাল প্রতিষ্ঠানই ভ্রষ্টাচারী হয়ে ওঠে তাহলে তাকে রোধ করবে কে!”**

একটা অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বলেছিলাম, যদি এই বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর মনে নীতিশিক্ষা প্রবিষ্ট করাতে পারেন, তাহলে জানবো আপনারা এই বিদ্যালয়ে প্রকৃত মানুষ গড়ছেন। ‘পরদ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়, মিথ্যাকথা বলিব না, উৎকোচ দিব না, উৎকোচ গ্রহণ করিব না, দেশমাতৃকার সেবা করিব’ ইত্যাদি শিশুমনে গেঁথে দিতে হবে। যাঁরা বয়সে বড় হয়ে গিয়েছেন, তাঁদের ফেরানো কঠিন। তাদের বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্মকে আমাদের নজর দিতে হবে। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক অভিভাবক প্রশ্ন করলেন, ‘‘ভারতবর্ষের বর্তমান ভ্রষ্টাচারের বাতাবরণে এই শিশুরা নীতিশাস্ত্র পড়ে শেষ হয়ে যাবে, পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে না।” হয়তো অনেকে পারবে না, কিন্তু যারা পারবে তারাই ভারতের ভবিষ্যৎ।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্থলসেনা ও বিমান বাহিনীর উচ্চতম অধিকর্তাদের সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, ভারত আট বিলিয়ন ডলারের বিমান এবং অস্ত্র উপকরণ ক্রয় করতে প্রস্তুত, তিনি আশা করেন এই উচ্চতম অফিসাররা নিজেদের সংযম রাখবেন। প্রলোভনের শিকার হবেন না। আমার মনে হয়, সামরিক বাহিনীর অফিসারদের পক্ষে এটা বড় লজ্জাকর দিন। যাঁরা সত্য, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, নিয়মানুবর্তিতার প্রতীক, তাঁদেরও আজ এমন উপদেশ দিতে হচ্ছে। সাধারণ ভারতবাসী কার দিকে তাকাবে? ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে ভারত (ইন্ডিয়া এগেনস্ট করাপশন,—আই এ সি) নামের সংগঠন আলোকপাত করে বলেছেন, আন্না হাজারের দেশব্যাপী আন্দোলন নিশ্চয়ই লোকপাল বিলকে মহাশক্তিশালী আইন হিসাবে প্রস্তুত করবে। কিন্তু যদি ওই লোকপাল প্রতিষ্ঠানই ভ্রষ্টাচারী হয়ে ওঠে তাহলে তাকে রোধ করবে কে? আর একটি সংগঠন ‘কোয়ালিশন ফর ডেমক্রেটিক মুভমেন্ট’-এর অরুণা রায়, অরুন্ধতী রায় ইত্যাদিরা প্রশান্ত ভূষণের সমর্থনে বলেছেন, ১৯৯১ এর সময় থেকে অর্থনৈতিক উদারিকরণ, বিশ্বায়ন এবং বিভিন্ন সরকারী সম্পত্তি, সংস্থা বেসরকারী হাতে চলে যাওয়ায় এই সর্বগ্রাসী অভূতপূর্ব ভ্রষ্টাচারের সূচনা হয়েছে। জাতীয় উপদেষ্টা সমিতির (এন এ সি) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কোনও একটি আইন প্রয়োগ করে ভ্রষ্টাচার সমাপ্ত করা যাবে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবিধ আইন করে ভ্রষ্টাচারের মোকাবিলা করতে হবে। আমার প্রশ্ন, একটি পরিবারের সহজ, সুন্দর, স্বচ্ছল ভবিষ্যৎ বিপদ-আপদের জন্য সংস্থান রেখেও জীবনযাপনের জন্য কত অর্থের প্রয়োজন? যাঁরা শিল্পপতি এবং বড় ব্যবসায়িক সংস্থার মালিক মাসের প্রথমদিনই কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য অর্থের সংস্থান তাঁদের করতে হয়, কিন্তু যাদের সে দায়িত্ব নেই অথচ স্বচ্ছলতা আছে তারা কেন ভ্রষ্টাচারী হন? অর্থশাস্ত্রেই আছে, ভোগের নিবৃত্তে আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পায়। ব্যতিক্রম শুধু মদ এবং অর্থ। যত পাবে ততই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যাবে। এখানেই ভ্রষ্টাচারের উৎপত্তি। ভারতের বেদ-বিজ্ঞান, গীতা, উপনিষদ এই রোগের মুক্তির জন্য বিধান দিয়েছেন। ত্যাগের মধ্যেই ভোগলালসার বিলুপ্তি। পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা, অন্যকে ফাঁকি দিয়ে অসৎভাবে উপার্জন, লোভ, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিলুপ্তি।

আমি মনে করি, ভারত থেকে ভ্রষ্টাচার দূরীকরণের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমমেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে যে হাজার হাজার কোটি টাকার ভ্রষ্টাচারের ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে, ভ্রষ্টাচারীদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হোক। মধ্যমমেয়াদি ব্যবস্থা হিসাবে লোকপাল নিয়োগসহ, বিভিন্নক্ষেত্রে আইন করে এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ করে সরকারি, বেসরকারি ক্ষেত্রে ভ্রষ্টাচার সমাপ্ত করার প্রয়াস করা হোক।

দীর্ঘমেয়াদি প্রতিকার হিসাবে ১৮৯৭-এ স্বামী বিবেকানন্দ মহামান্য তিলককে যে উপদেশ দিয়ে ছিলেন, সেই মতো মানুষ তৈরির ব্যবস্থা করা হোক। ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বেদ বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী দেশপ্রেমী মানুষ গড়া হোক। তাহলেই ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

প্রগতির প্রতিবন্ধক দুর্নীতি আর কালো টাকা

ভারতে জাতীয় এবং ব্যক্তিগত আয় বাড়লেও দুর্নীতির পরিমাণ বাড়ছে। দেশের লোকের পরিশ্রম আর প্রতিভার বিকাশ বা প্রগতি হচ্ছে, ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে, কিন্তু অসৎ রাজনীতি আর আইন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা আর দক্ষতা দেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে না। প্রগতির সমস্ত সুযোগ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোবার আগে ওইসব অসৎ রাজনৈতিক নেতা আর অফিসাররা সব গ্রাস করছে।

ডঃ অশ্বিনী মহাজন

'ট্রান্সপেরেন্সি ইনটারন্যাশনাল' নামে এক আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির আনুমানিক সূচক তৈরি করে। আর ওই সূচক অনুযায়ী কোনও দেশ যদি ১০ পায় তাহলে সেই দেশকে পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত বলা যায়। এবং সেইসঙ্গে বলা যেতে পারে সেদেশের অর্থনৈতিক প্রশাসনে দক্ষতা যথেষ্ট। এই ছবিটাকে যদি সামনে রেখে ভারতের দিকে তাকানো যায় তাহলে এখানকার ছবিটা কীরকম? ১৯৯৫ সালে এই সূচক অনুযায়ী ভারত ছিল ২.৭৮। মনে রাখতে হবে এই অনুমান দুর্নীতির মাপকাঠি নয়, তার অনুমানের মাত্রা। এই কারণে ২০০৮-এ ২-জি স্পেকট্রাম কাণ্ডের দুর্নীতির সময় এই সূচকে কোনও অদলবদল হয়নি। যখন দুর্নীতির আভাস মেলে তখন তা আদালত ও গণমাধ্যমের আওতায় আসে। এইভাবে কমনওয়েলথ খেলার সময় দুর্নীতির হার বাড়ে। ২০১০-এ ৩.৩ হয়ে যায়।

দুর্নীতির ক্রম অনুসারে আমাদের দেশ ২০০৭ সালে ৭২তম জায়গায় ছিল। পরে তা নেমে গিয়ে ৮৭ স্থানে পৌঁছায়। ট্রান্সপেরেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এটাই বলতে চায় ভ্রষ্টাচারীদের কুকর্ম বাধাহীনভাবে চলতে থাকায় ২৬,৭৬৮ কোটি টাকা উধাও হয়ে গেছে। সেই টাকার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানি, রেলপথ ইত্যাদি।

কালো টাকার অজগর

এদেশে কালো টাকা, বেআইনি বেনামী সম্পত্তি, কর ফাঁকি ইত্যাদি কোনও নতুন ব্যাপার নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ নিজস্ব পদ্ধতিতে এ ব্যাপারে কিছু মত প্রকাশ করেছেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে কালডার পরে বাচ্চু কমিটি, বংগমেকর ও পি চোপড়া, পুনম গুপ্তা ও সঞ্জীব গুপ্তা, রাষ্ট্রীয় লোকবিত্ত ও নীতি সংস্থান, অধ্যাপক সুরজভান গুপ্তা, অধ্যাপক অরুণ কুমার প্রমুখ নিজেদের মত বিভিন্ন সময়ে জানিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের এটা মানতে হয়েছে যে কালো টাকার নামে সমান্তরাল অর্থব্যবস্থা ৫০ শতাংশের বেশি। এই কালো টাকাকে বাইরে আনা আর তাকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের কিছু উদ্যোগও দেখা গেছে। ৫টি স্বেচ্ছা-ঘোষণা আর একবার স্পেশাল বিয়ারার বন্ড প্রয়োগ করে সরকারের মাধ্যমে ওই কালো টাকা বাইরে আনার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৪১৬৮২ কোটি কালো টাকা এইসব পরিকল্পনার মাধ্যমে বাইরে আনা সম্ভব হয়েছে। হাল আমলে কালো টাকা নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হয়েছে তখন সরকার ওই ধরনের কয়েকটি পরিকল্পনা আবার সামনে আনতে চাইছে।

কিছুকাল ধরে দেখা যাচ্ছে কালো টাকার ভাবনার সম্পূর্ণ বদল ঘটেছে। আগে এমন মানা হোত উপার্জিত অর্থের কর না দেওয়াটাই কালো টাকা। এজন্যে আগে কালো টাকা বাইরে আনার ব্যাপারে নানান পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যাতে কালো টাকা বিভিন্ন উন্নয়নমুখী পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যায়। এখনও পর্যন্ত কালো টাকা বাইরে আনার ক্ষেত্রে যেসব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে মোট অর্থ এসেছে ১১,০০০ কোটি টাকারও কম। এরকম আরও কিছু পরিকল্পনার মাধ্যমে কালো টাকা বাইরে আনার যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তার উদ্দেশ্য সমসময়ের টাকার মূল্য অনুযায়ী ওই টাকা ব্যবহার করা।

দুর্নীতির পর দুর্নীতি

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী ২-জি স্পেকট্রাম অনুসারে রাজকোষের ১.৭৬ লক্ষ

কোটি টাকা লোকসান। এই লোকসান আসলে দুর্নীতি পরায়ণ লোকদের লাভ। এইভাবে কমনওয়েলথ খেলার আয়োজনে হাজার কোটি টাকার গোলমাল হয়েছে। এছাড়া তেলগী ঘোটালা, সত্যম ঘোটালা ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক দুর্নীতি আছে যা প্রকাশ পায়নি।

এসব দুর্নীতি দেশে নতুন কিছু নয়। তেলগী দুর্নীতিতে যে পরিমাণ রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হয়নি এখনও। তাও ৫০ হাজার কোটি টাকার কম নয়। বড় বড় ব্যবসায়ীদের কর ফাঁকি নিয়ে মাঝে মাঝে কথা ওঠে। কিন্তু আইনগতভাবে কিছু করা যায়নি। আমজনতা কিছু দুর্নীতির তথ্য পায় যখন সেসব নিয়ে সংসদ বা বিধানসভায় হইহল্লা হয়। কোনও সমাধান হয় না। রাজকোষের লোকসান পূরণ হয় না। আসল দোষী রাজনীতিক আর আমলারা দিব্যি বেঁচে বেরিয়ে যান। এমন মনে হয় তথ্যের অধিকার চালু হবার পর দুর্নীতিরোধের চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে আমলা এবং রাজনীতিকরা দিব্যি পার পেয়ে যাচ্ছে। কমনওয়েলথ খেলা আয়োজনে দুর্নীতি ট্রান্সপেরেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এ ভারতের সক্ষমতার সূচক কমে ৩.৩ পৌঁছেছে। ক্যাগ ২-জি স্পেকট্রাম দুর্নীতি প্রকাশ করেছে তাতে ওই সূচক আরও কমত। মর্যাদা আর পারদর্শিতায় আমাদের দেশ এখনও ১৭৮ দেশের মধ্যে ৮৭তম স্থানে আছে। এই আশাও হয় এমন কোনও দিন আসবে ভারতকে ভ্রষ্টতম দেশ বলা হবে।

লুঠের ধন যাচ্ছে কোথায়

এটা স্পষ্ট যে, লুঠ-পাটের অর্থ দেশের কাজে লাগে না। বাস্তবে দেশ গড়ার জন্য বন্টন করা অর্থ রাজনৈতিক নেতা অফিসার আর দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজন কোনও না কোনও ভাবে লুঠ করে নিজের ভাণ্ডার ভরায়। প্রশ্ন, ওই টাকা যায় কোথায়? ওই টাকায় বেনামী সম্পত্তি কেনা হয়, হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা বিদেশে পাঠিয়ে সুইজ্যারল্যান্ড বা অন্য দেশের করমুক্ত অর্থসংস্থায় জমা করা হয়। সেইসঙ্গে শেয়ার বাজারে লাগানো হয়। সুইজ্যারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে এই সুবিধে আছে সেখানে টাকা এক বিশেষ নম্বরে জমা হয়। যে টাকা জমা করছে এবং অন্যান্য তথ্য অল্প কয়েকজন লোকের জানা থাকে। আজকাল হাওয়ালার ব্যবসা এত বেশি হয়েছে যে তার ফলে সব তথ্য অনেক বেশি জানা হয়ে যায়।

কিছুকাল আগে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা পরামর্শদাতারা জানিয়েছিলেন, ভারতের শেয়ার বাজারে জঙ্গি সংগঠনরা টাকা বিনিয়োগ করেছে। যা দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক। দেশ লুঠ করা অর্থ আবার শেয়ার বাজারে লাগিয়ে টাকা তোলা হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতা ও অফিসাররা বড় বড় ব্যবসায়ীর স্বার্থ দেখে। যে অর্থ রোজগারের সুযোগ করে দিয়েছে তা সুইস ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে। এছাড়া যেসব ব্যবসায়ী দেশের বাইরে কাজ করেন তাঁরা আমদানি রপ্তানির হিসেবে কারচুপি করে সহজেই দেশের টাকা বাইরে পাঠান। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অস্ত্রশস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে দালালি বাবদ পাওয়া টাকা সুইস ব্যাঙ্কে জমা করার কথা প্রকাশ পেয়েছে। বোফর্স কামানের ৬৪ কোটি টাকা সুইস ব্যাঙ্কে জমা হয়েছিল। এ ব্যাপারে ভারত সরকার সুইজারল্যান্ড সরকারকে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে বলে। তা করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারি নিয়মকানুনের ঢিলেমিতে ওই অর্থ বের করে নিয়েছে জড়িত লোকজন।

দুর্নীতি আর কালো টাকার সরকারি সংরক্ষণ

কিছু অসৎ আমেরিকাবাসী দেশ থেকে লুঠ করা অর্থ সুইস ব্যাঙ্কে জমা করে। তা জানার পর আমেরিকার সরকার সুইজারল্যান্ড সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের বাধ্য করে ওইভাবে টাকা যারা জমা দিয়েছে এবং পরিমাণ কত তা সে তথ্য দিতে। তা করে আমেরিকা কালো টাকা ফেরত এনেছিল। আপশোসের ব্যাপার ভারত সরকার একবার জার্মানির ব্যাঙ্কে অন্যায়ভাবে মজুত টাকার তথ্য জানল। সরকার সেসব তথ্য আদালতেও পেশ করল না। যুক্তি দেখাল আন্তর্জাতিক চুক্তি তাতে লঙ্ঘন হবে। সুইসব্যাঙ্কে জমা টাকা দেশে ফেরত আনার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নেওয়া হলো না।

আর্থিক উন্নতির সঙ্গে বাড়ছে দুর্নীতি

বিড়ম্বনা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি দেখা যায় গরীব দেশে। ধনীদেশে আইনকানুন আর ব্যবস্থা মানতে বাধ্য হয় সবাই। সেখানে দুর্নীতি কম আর আত্মমর্যাদা বেশি। তার মানে উন্নতির সঙ্গে মর্যাদার মাপকাঠিও বাড়ে। ভারতের হাল ঠিক বিপরীত। ভারতে জাতীয় এবং ব্যক্তিগত আয় বাড়লেও দুর্নীতির পরিমাণ বাড়ছে। দেশের লোকের পরিশ্রম আর প্রতিভার বিকাশ বা প্রগতি হচ্ছে, ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে, কিন্তু অসৎ রাজনীতি আর আইন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা আর দক্ষতা দেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে না। প্রগতির সমস্ত সুযোগ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোবার আগে ওইসব অসৎ রাজনৈতিক নেতা আর অফিসাররা সব গ্রাস করছে। দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে আমদানির কারণ রাজস্বের পরিমাণ বাড়ে। কেন্দ্র সরকারে ১৯৮০-৮১-তে মাত্র ৯৩৯০ কোটি টাকা রাজস্ব ছিল। ২০১০-১১-তে তা দাঁড়ায় ৫,৩৪,০০০ কোটি টাকার বেশি। তার মানে ৩০ বছরে ৫৫ গুণ বেড়েছে। জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে তা ৪৩ গুণ মাত্র। টেলিকম ক্ষেত্র বা খনি ক্ষেত্রে আয় কম হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে, সেখানে আগে অনেক টাকা রাজস্ব আমদানি হয়েছে। টেলিকম ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতির দরুন দুর্নীতি বেশি ছড়িয়েছে।

দু দশক আগে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী সুখরাম থেকে বর্তমান যোগাযোগ মন্ত্রী এ. রাজা পর্যন্ত এই তথ্যের সমর্থনেই সব কর্ম করেছেন।

এই দুর্নীতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সোজাসুজি সম্বন্ধ আছে। রাজস্ব হ্রাসের কারণ সরকারকে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। ২০১০-১১ সালে দেশের বাজেটে ৪ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি থেকে যায়। গত বছরে ৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি হয়েছে। এত বড় ঘাটতি পূরণ করার জন্যে সরকারকে ঋণ নিতে হয়েছে। যার দরুন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে করা হয়েছে ঋণী। যখন সরকার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ঋণ করতে পারে না তখন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে কাজ চালাতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এজন্যে অতিরিক্ত টাকা ছাপায়। তাতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে দেশে। আর মুদ্রাস্ফীতির কারণে ঘটে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। এখনকার টেলিকম দুর্নীতি যদি না হোত ক্যাগ অনুযায়ী ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যেত। যদি এমন হোত আমাদের রাজকোষের ঘাটতি ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা কম হোত। ওইরকম হলে অতিরিক্ত টাকা ছাপতে হত না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর ঋণের বোঝা চাপত না। দুর্নীতি আর মূল্যবৃদ্ধি সরকারি ঋণ নেওয়ার মুখ্য কারণ বলে দায়ী করা যায়।

উন্নতির প্রতিবন্ধক

কিছুকাল আগে সরকার শিক্ষার অধিকার সম্বন্ধে বিধিনিয়ম চালু করেছে। আমরা সবাই জানি ভারতের সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সকলের নাগালে পৌঁছোবে সরকারি খরচে। সংবিধান গৃহীত হবার পর ৬০ বছর পেরিয়ে গেলো, অথচ প্রাথমিক শিক্ষাকে এখনও সুনিশ্চিত নয় সকলের কাছে। এখনকার খতিয়ান অনুযায়ী সরকার মাত্র ৩০ হাজার কোটি টাকা খরচ করলে শিক্ষার অধিকার সকলের কাছে সুনিশ্চিত হবে। আর এই টাকার পরিমাণ টেলিকম দুর্নীতির ৬ ভাগের একভাগ মাত্র।

আজ সরকার উচ্চশিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। আর সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ও সেবার জন্যে ২০১০-১১ সালের তথ্য অনুযায়ী সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে মাত্র ২৩,৫৩০ কোটি টাকা ব্যয়ের সংস্থান রেখেছে। মোটামুটি অনুমান সরকার মাত্র ৩০ হাজার কোটি টাকা বাড়তি খরচ করলে উচ্চশিক্ষা আর স্বাস্থ্য পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

আজ আমাদের দেশে প্রতি এক লক্ষ জননীর মধ্যে ২৩০ জন নিজের শিশুকে জন্ম দেওয়ার আগেই এই সংসার থেকে বিদায় নেন। আজও প্রতি হাজারে ৬৬ জন শিশু নিজের পঞ্চম জন্মদিন পালনের সুযোগ পায় না। এসব ব্যাপারের সমাধান সম্ভব হতে পারে তখনই যখন দেশে দুর্নীতির সমাপ্তি ঘটবে।

পথ চেয়ে দিন গোণা

অন্য রকম

ফিরোদকোটে নিজের বাড়িতে সুরজিতের পরিবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আশা **(hope)** কারে কয়? কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, 'ধন্য আশা কুহকিনী'। আর মধুসূদন দত্ত বলেছিলেন, 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়'। একই আশা-র দুই রূপ। কেউ আশায় মরছে, কেউ বা আশায় বাঁচছে। আপাতত আশায় বাঁচতেই চাইছেন সুরজিৎ সিংয়ের পরিবার। জম্মু-কাশ্মীরে যাওয়া ৫৭ ব্যাটেলিয়নের অন্যতম সৈনিক শ্রী সিং আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে পাক-সেনাবাহিনীর দ্বারা অপহৃত হন। তাঁর স্ত্রী আংরেজ কাউরের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে, হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়েছে, কিন্তু হৃদয় আজও পথ চেয়ে আছে স্বামী সুরজিতের জন্য।

কিন্তু আংরেজ-এর 'আশা'কে কি খুব অমূলক বলা চলে? গত ২৮ এপ্রিল পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মী আনসার বার্নি দাবী করেন পাকিস্তানের কোয়েট্টার জেলে '৭১-এর যুদ্ধে বন্দী এক ভারতীয় জেল বন্দীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন তিনি। আনসারের দাবী অনুযায়ী সেই বন্দীর নাম নাকি সুরজিত সিং। বিয়ের পর মাত্র বছর-তিনেক স্বামীকে কাছে পেয়েছিলেন আংরেজ। আনসারের কথা শুনে সত্যিই আশায় বুক বাঁধছেন তিনি—"আনসার বার্নি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আগামী একমাসের মধ্যে আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন বলে। সুরজিত পুত্র অমৃকের যখন মাত্র দেড় বছর বয়স তখনই তিনি তাঁর বাবাকে হারিয়ে ফেলেন। অমৃক জানালেন,—"গত কুড়ি বছর ধরে আমি আমার বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। পাকিস্তানের জেল থেকে যাঁরাই বেরিয়েছেন, তাঁদের সবাইকেই বাবার কথা জিজ্ঞাসা করেছি। কেউ সরাসরি বাবাকে দেখেছেন বলেছেন, কেউ বা তাঁর কথা শুনেছেন। ফিরোজপুরের এক সৈনিক সতীশ কুমার মারওয়াহাও পাক সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলেন এবং ৮০-এর দশকে ছাড়াও পান। তিনি কোট লাখপাত জেলে আমার বাবার সঙ্গেই ছিলেন। পাক-জেলে ৩৬ জন ভারতীয় বন্দী যাঁরা সম্প্রতি ছাড়া পেয়েছেন, তাঁরা আমার বাবার ছবি চিনতে পেরেছেন এবং আমায় বলেছেন, তিনি এখনও জীবিত রয়েছেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলো, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সুরজিত সিং-কে মৃত বলেই ঘোষণা করেছে এবং তার পরিবার পেনশনও পাচ্ছে। যদিও বার্নি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এনিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা করেছেন। পাঞ্জাব সরকারও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু পাক-জেলে বিনা দোষে কত হতভাগ্য বন্দী চোখের জল ফেলছেন, সেকথা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তা-ব্যক্তিরা জানেন কি? চল্লিশ বছর নেহাত কম সময় নয়, চোখের দৃষ্টি প্রায় নিভে আসা আংরেজ চোখের আলোয় চোখের বাহিরে স্বামী সুরজিতকে একবার অন্তত দেখতে চান। অমৃকের বেদনাঘন বক্তব্য—"আমার মা কিন্তু বরাবরই বিশ্বাস করে এসেছেন যে আমার বাবা জীবিত। সেই কারণে বাবার ছবিতে কখনও মালাও দিতে দেননি তিনি।" কেন্দ্রীয় সরকার, তোমার ঘুম কবে ভাঙবে?

উলফা জঙ্গিদের দরাজ হাতে টাকা দিচ্ছে সরকার

সংবাদদাতা ॥ উগ্রপন্থীদের দরাজ হাতে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে জম্মু-কাশ্মীরকে ছাড়িয়ে গেল অসম সরকার। এটাই মনমোহন-চিদাম্বরম্ এবং তরুণ গগৈ-এর উলফা জঙ্গিদের সঙ্গে শান্তিবার্তার নবীনতম অধ্যায়। সূত্রমতে, এই ব্যাপকভাবে বিলাসী জীবনযাপনের জন্য টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা গত জানুয়ারী মাসে মনমোহন-অরবিন্দ রাজখোয়া (চেয়ারম্যান, ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম) বৈঠকেই চূড়ান্ত হয়েছিল। সেইমতো, কেন্দ্র-সরকার রাজ্য সরকারের মাধ্যমে আত্মসমর্পণকারী নেতাদের ও তাদের পরিবার-পরিজনবর্গকে জীবনযাপনের খরচ হিসেবে দৈনিক চল্লিশ লক্ষ টাকা দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক অফিসার উপরোক্ত সংবাদ জানিয়েছেন। আত্মসমর্পণকারী নেতাদের মধ্যে প্রমুখ হলেন—চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখোয়া এবং সহ-সভাপতি প্রদীপ গগৈ। যতদূর জানা গিয়েছে, উলফা নেতা-ক্যাডারদের পরিবার-পরিজনদের সংখ্যাটা চারশোর কাছাকাছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সূত্র অনুসারে টাকার অঙ্কটা আগামীদিনে আরও বাড়ানো হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উলফা'র বিরুদ্ধে এতাবৎ বিবিধ অভিযোগের মধ্যে অসম থেকে জোর-জবরদস্তি শত শত কোটি টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। সেই টাকা দিয়ে নেতাদের বিলাসবহুল জীবনযাপন, ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ এবং চীন-মায়ানমার থেকে ব্যাপক পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র কেনাও হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে বারে বারে অভিযোগ উঠেছে।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসার পর উলফা নেতাদের ২০০৯-এ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গ্রেপ্তার করে। খাতায়-কলমে এরকম বলা হলেও ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ভারত সরকারের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু অলিখিত শর্তের বিনিময়ে বাংলাদেশই বি এস এফ-এর হাতে তুলে দেয়। পরবর্তী সময়ে ভারত সফরে এসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক আর্থিক সহযোগিতার কার্যকরী প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। তার ফলে বাংলাদেশের দু' তরফা লাভ হয়। এক, 'ভয়ঙ্কর উলফা সন্ত্রাসবাদীর আশ্রয়দাতা তথা মদতদাতা বাংলাদেশ'—বদনাম থেকে মুক্তি এবং দ্বিতীয়— আর্থিক প্যাকেজ।

ওদিকে অসম সরকার প্রথম সারির উলফা নেতা—অরবিন্দ রাজখোয়া, শশধর চৌধুরী, চিত্রবন হাজারিকা, রাজু বরুয়াদের মুক্তি দেওয়ার পর তারা সরাসরি জানিয়ে দেন যে, তারা 'আত্মসমর্পণ' করেননি। তার আগে অরবিন্দ রাজখোয়া জেল থেকে তরুণ গগৈ সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বন্দীদশায় 'শান্তিবার্তা' সম্ভব নয়। এছাড়া অরবিন্দ রাজখোয়া জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজেদের বাড়িতে পৌঁছালে স্বাধীন অসমের দাবিতে স্লোগান দেওয়া হয়। জেলে বন্দী থাকাকালীন সাতজন প্রথম সারির উলফা নেতাকে একত্রে সারাদিন বৈঠক করার সুযোগও দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। তাছাড়া বাংলাদেশ বা ভারত সরকার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও উলফা'র কম্যাণ্ডার ইন্ চীফ্ পরেশ বরুয়ার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। অথচ পরেশ বরুয়া শান্তিবার্তার বিপক্ষে সংবাদ মাধ্যমে চরম হুমকি ও বিরোধিতামূলক বিবৃতি দিয়ে চলেছে। আরও একটি স্পর্শকাতর অথচ ব্যবহারিক বাধা শান্তিবার্তার জন্য বহাল রয়েছে। আর তা হলো—এখনও অবধি ধৃতরা বা সরকারি ভাষায় আত্মসমর্পণকারী উলফা ক্যাডাররা তাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কিছুই জমা দেয়নি বা কোথায় গোপনে রক্ষিত তাও জানায়নি। একটি ধারণা মতো দু'জন শীর্ষস্থানীয় উলফা নেতার হেফাজতে ওই শস্ত্রভাণ্ডার সুরক্ষিত আছে। তারা এখনও স্থির করে উঠতে পারেননি কি করবেন। ব্যাঙ্কে যেমন ডবল লক সিস্টেমে ভল্টে দামী গহনা রাখা হয় সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি চাবি উলফা নেতার কাছে এবং অন্যটি সরকার পক্ষের কাছে রাখা হবে। এই ডবল লক সিস্টেমটাই প্রচলিত আত্মসমর্পণকৃত জঙ্গিদের ক্ষেত্রে। ব্যতিক্রম শুধু এন এস সি এন-আই এম জঙ্গিদের বেলায় ঘটেছে। তাদের আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র কোহিমার কাছে 'চিদেমা' শান্তি শিবিরে রাখা আছে গত ১৯৬৪ সাল থেকে। অতি সম্প্রতি এন ডি এফ বি জঙ্গিদের ক্ষেত্রে ডবল লক ব্যবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র রাখা আছে। বাস্তবিক শান্তি আলোচনা শুরুর আগেই ভারত উলফা'র কাছে ওই ডবল লক সিস্টেমে অস্ত্রশস্ত্র জমা রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। ইতিমধ্যে অবশ্য কেন্দ্র ও অসম রাজ্য সরকার নলবাড়ি জেলায় ধৃত- আত্মসমর্পণকৃত নেতা-ক্যাডারদের জন্য একটি পৃথক আশ্রয় শিবির (designated camp) তৈরির বিষয়ে সহমত হয়েছে। সরকারি সূত্র অনুসারে ওখানেই জঙ্গিদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র মজুত রাখা হবে।

তরুণ গগৈ

অরবিন্দ রাজখোয়া

খালেদা আমলে কয়েক হাজার হিন্দু মহিলা গণধর্ষিতা

সংবাদদাতা।। বাংলাদেশে সরকারি মদতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কাহিনী সুবিদিত। খালেদা বা হাসিনা কোনও সরকারের আমলেই এই অত্যাচার বন্ধ হয়নি। হয়তো অত্যাচারের মাত্রা কমবেশি হয়েছে অথবা কৌশল বদল হয়েছে। খালেদার আমলে কয়েক হাজার হিন্দুমহিলার গণধর্ষিতা হওয়ার একটি রিপোর্ট সম্প্রতি সেদেশে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনে জেতার পর প্রায় দেড় বছর ধরে হিন্দুদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছিল বেগম খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি ও জামাত ই ইসলামি জোট। দু হাজারের বেশি হিন্দু মহিলাকে গণধর্ষণ করেছিল সরকারি দলের কর্মী ও সমর্থকেরা। বি এন পি'র কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাও এই অত্যাচারের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। হিন্দুদের অপরাধ ছিল, তাঁরা শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগকে ভোট দিয়েছিলেন। এই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে সেই সময় বহু হিন্দু বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন। সেই সময় ভারত সরকারও এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বেশিরভাগ হিন্দুরা বরাবরই আওয়ামি লিগের সমর্থক। ফলে প্রায়ই অন্য দলগুলির রোষের শিকার হতে হয় তাঁদের। কিন্তু আওয়ামি লিগও বেশিরভাগ সময় তাঁদের পাশে থাকে না। তৎকালীন বিরোধী দল হিসেবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধে কোনও উদ্যোগ নেয়নি আওয়ামি লিগ। এমনকী সরকার গঠনের পরেও বি এন পি জামাতের অপরাধী নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করেনি আওয়ামি লিগ। বরঞ্চ বি এন পি'র মৌলবাদী মুসলিম নেতাদের সঙ্গে আওয়ামি লিগের নেতাদের সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে। এই সম্পর্কের জেরেই নাকি সম্প্রতি হিন্দু মন্দিরগুলিতে হামলা চলছে। আওয়ামি লিগ কেবল একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দায় সেরেছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ২০০১ সালে ৩,৬২৫টি বড় মাপের অপরাধের ঘটনা ঘটেছিল। এর মধ্যে অগ্নিসংযোগ, লুঠপাট, হত্যার সঙ্গে গণধর্ষণও ছিল। বাংলাদেশের দক্ষিণের ভোলা, বরিশাল, পৌরনন্দী, আসোইলঝাড়া জেলাতে এই অত্যাচার চলেছিল। হিন্দুরাই এই অপরাধের শিকার হয়েছিলেন। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। দায়সারা তদন্ত করে প্রমাণের অভাবে অপরাধীদের ছেড়ে দেয়। তদন্তকারীরা অত্যাচারিতদের সঙ্গে কথা তো দূরের কথা দেখা পর্যন্ত করেনি। বাংলাদেশের কবি দাউদ হায়দার ২০০১ সালে ভারতে এসে আশ্রয় শিবিরে থাকা অত্যাচারিত হিন্দুদের সঙ্গে কথা বলে দেশে ফিরে তাঁদের উপর হওয়া অত্যাচারের কাহিনী লিখেছিলেন। এই অপরাধে তাঁকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে কারাগারে পুরে দেয় তৎকালীন বি এন পি-জামাত সরকার। ছাড়া পাওয়ার পর তিনি বার্লিনে রয়েছেন। তাঁকে দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখিয়েছে আওয়ামি সরকার। আওয়ামি সরকারের আমলেও সংখ্যালঘু হিন্দুরা খুব একটা শান্তিতে নেই। ডাকাতির নামে হিন্দুমন্দিরে হামলা তো রইয়েছে, হিন্দু মেয়ে অপরহণের ঘটনা, হিন্দু বাড়ীতে চুরির ঘটনা খুব একটা কমেনি।

লাদেন খতমে জঙ্গিদের মনোবল ভাঙ্গবে বাংলাদেশে

প্রতিবেদক।। নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক বিশ্লেষকরা বলছেন, পাকিস্তানে মার্কিন বাহিনীর হাতে আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন নিহত হওয়ায় বাংলাদেশে জঙ্গিবাদীরা ব্যাপকভাবে হতাশ হয়ে পড়বে। কারণ লাদেন ছিল তাদের কাছে 'আদর্শ আলোকবর্তিকা'। নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের জঙ্গি গ্রুপ এখন বুঝতে পারবে যে, তারা তাদের অপকর্মের পরিণতি থেকে রেহাই পাবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ আরও বলেন, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকদের এখন পাকিস্তান থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস এ্যান্ড স্টাডিজের (বি আই পি এস এস) প্রধান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মুনিরুজ্জামান বলেছেন, বাংলাদেশের জঙ্গিদের জন্য এটি বড় ধরনের আঘাত, যদিও লাদেনের মৃত্যু তাদের জন্য কোনও হুমকি নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জঙ্গি গ্রুপগুলো সরাসরি আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তবে লাদেন তাদের আদর্শের আলোকবর্তিকা।

সাবেক সেনাপ্রধান লে, জেনারেল হারুনুর রশিদ বলেন, লাদেন নিহত হওয়ায় বাংলাদেশের জঙ্গিরা সাময়িকভাবে মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। তবে বাংলাদেশকে তার জঙ্গি বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস নির্মূলে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার এখনই উপযুক্ত সময়। কারণ জঙ্গিবাদ আমাদের একক সমস্যা নয়। মুনিরজ্জামান লাদেন নিহত হওয়ার ঘটনাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জঙ্গিবাদবিরোধী অভিযানের বিরাট মাইলফলক ও রাজনৈতিক বিজয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তার পূর্বসূরী জর্জ বুশ বেপরোয়া পদক্ষেপ নিয়েও এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, লাদেন নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে একটি সন্ত্রাসবাদ যুগের অবসান হলো। তবে এর থেকে আমেরিকাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শিক্ষা নিতে হবে। কেননা, আমেরিকার এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু লাদেন এক নম্বর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল।

কন্যাভ্রূণ হত্যায় নারী-পুরুষ অনুপাতে দুস্তর ব্যবধান হরিয়ানায়

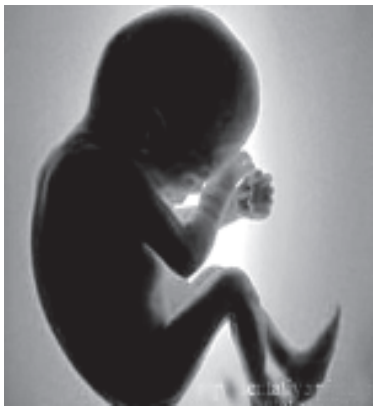

হরিয়ানায় বর্তমানে পুরুষের সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ, নারীর সংখ্যা সেখানে ১ কোটি ১৮ লক্ষ। নারী-পুরুষের ব্যবধান ১৭ লক্ষ ৫৭ হাজার। বিগত জনগণনায় এই ব্যবধানটাই ছিল ১৫ লক্ষ ৮৩ হাজার। সুতরাং নারী-পুরুষের ব্যবধান ক্রমবর্ধমান।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পরিসংখ্যানটার দিকে এক ঝলক তাকালে রীতিমতো আঁতকে উঠতে হয়। শূন্য থেকে ৬ বছর বয়সী ছেলেমেয়ের অনুপাত ১০০০ : ৭৭৪। সাম্প্রতিকতম জনগণনার সমীক্ষায় এমনই বিস্ফোরক ও মারাত্মক তথ্যের সাক্ষী হয়েছে হরিয়ানার ঝজ্জর জেলা। এই জেলার দু'টি গ্রামের অবস্থা অবশ্য জেলার অন্যান্য গ্রামের চেয়েও ভয়ংকর। ঝজ্জর জেলার বেহরানা গ্রামের প্রতি হাজার জন ছেলেয় মেয়ে মাত্র ৩৭৮ জন এবং ধিমানা গ্রামে মেয়েদের এই সংখ্যাটাই মাত্র ৪৪৪। ওই বয়সের নিরীখে হরিয়ানায় ছেলে ও মেয়ের সংখ্যার ব্যবধান চার লাখের কিছু বেশি—৪ লক্ষ ৭ হাজার ৩৭০ জন। ২০০১-এর জনগণনার নিরীখে এই ব্যবধানটাই ছিল ৩ লক্ষ ৩১ হাজার। সবমিলিয়ে হিসেবটা এরকমই দাঁড়াচ্ছে যে, হরিয়ানায় বর্তমানে পুরুষের সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ, নারীর সংখ্যা সেখানে ১ কোটি ১৮ লক্ষ। নারী-পুরুষের ব্যবধান ১৭ লক্ষ ৫৭ হাজার। বিগত জনগণনায় এই ব্যবধানটাই ছিল ১৫ লক্ষ ৮৩ হাজার। সুতরাং নারী-পুরুষের ব্যবধান ক্রমবর্ধমান।

এর কারণটা খুবই সুস্পষ্ট। ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, 'আপনি এখানে একজন মহিলাকে মাত্র তিরিশ হাজার টাকায় পেয়ে যাবেন, কিন্তু একটা দুধেল গাই কিনতে আপনার খরচ হবে অন্তত ৭০ হাজার টাকা।' অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। সেখানে মেয়ে মানেই বোঝা এবং ব্যাঙের ছাতার মতো ১,১৭৪টি বহুশ্রুত সেন্টার গজিয়ে উঠেছে যেখানে মেয়ে বেচা-কেনার দরদাম হয়। সেখানে কয়েকজন এমনও মন্তব্য করছেন যে, 'আপনি দরদাম করলে হয়তো কম দামে মেয়ে পেয়ে গেলেও যেতে পারেন, কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি খরচ পড়বে আপনাকে অসম কিংবা আর কোনও দূরবর্তী জায়গায় যেতে হলে।' এক হাজার থেকে ২০ হাজার টাকার রেঞ্জের মধ্যে গর্ভপাতের বন্দোবস্ত সেখানে হয়ে যাবে ব্যাঙের ছাতার মতো যত্র-তত্র গজিয়ে ওঠা বিনা-নথিভুক্তহীন অজস্র সেন্টারগুলিতে। ফলতঃ সম্পূর্ণ বে-আইনি প্রেগনেন্সি টেস্টের মাধ্যমে গর্ভের লিঙ্গ নির্ধারণ হচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তা স্ত্রীলিঙ্গ হলে, গর্ভাবস্থাতেই তাকে খুন করা হচ্ছে। পরিস্থিতিটা মালুম হবে সেখানকার মানুষের মুখের ছড়ায়—''ছেলে মরে অভাগার, মেয়ে মরে ভাগ্যবানের।'' ৬৪ ছুঁতে চলা স্বাধীনতার প্রাক্কালেও পরিস্থিতি আজ সেখানে এতটাই মর্মন্তুদ।

বেহরানা গ্রামের জনৈক কৃষক জানালেন, 'এহেন পরিস্থিতির জন্য কিন্তু মেয়েরাই দায়ী।' কারণ নার্স কিংবা সহকারী নার্স অথবা আয়ারা-ই কিন্তু মেয়েদের গর্ভ নির্ধারণে এবং গর্ভজাত শিশুর লিঙ্গ স্ত্রী হলে গর্ভপাত করতে আগাগোড়াই মুখ্যতঃ সাহায্য করে থাকেন। প্রসঙ্গত, বেহারানা গ্রামটি জাঠ অধ্যুষিত এবং ৮০০০-এর কাছাকাছি জনসংখ্যা। এখানকার মানুষজনদের অধিকাংশই সেনাবাহিনীতে রয়েছেন। কেউ এখনও রয়েছেন, কেউ বা অবসর নিয়েছেন। মোট কথা কন্যা-ভ্রূণ হত্যা যেখানে সারাদেশেই একটা ব্যাধি, সেখানে বেহরানা গ্রামের কাছে অন্যরকম কিছু আশা করাই যেতে পারত। কিন্তু সচেতনার অভাব সেখানেও কেন পরিলক্ষিত হলো তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে।

বিগত একশ বছরের মধ্যে এবারই হরিয়ানার নারী পুরুষের সামঞ্জস্যের হার সবচেয়ে ভাল, ৮৭৭ জন নারী প্রতি ১০০০ জন পুরুষে। ইতিপূর্বে স্বাধীনতার ঠিক পরেই '৫১-এ যে জনগণনা হয়েছিল তাতে ১০০০ জন পুরুষে নারীর হার ছিল ৮৭১। সাম্প্রতিকতম জনগণনার আগে নারী পুরুষের সামঞ্জস্যের নিরীখে সেটাই ছিল অপেক্ষাকৃত সামঞ্জস্যপূর্ণ। শূন্য থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে হরিয়ানায় ছেলে-মেয়ের অনুপাত ১০০০ : ৮৩০ হলেও হরিয়ানাসহ ভারতের আরও ছ'টি রাজ্যে এই অনুপাতে নারীর সংখ্যাবৃদ্ধি কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দিয়েছে। ২০০১-এর জনগণনায় ওই বয়সের ক্ষেত্রে ১০০০ জন ছেলে প্রতি মেয়ের সংখ্যা ছিল ৮১৯ জন। গত ৫ বছরে রাজ্য-সরকার বহুশ্রুত গর্ভ-পাতক স্থানগুলিতে ১১,৬০৮ বার হানা দিয়ে ১৩৩টি গর্ভ-পাত যন্ত্র বাজেয়াপ্ত, ২৭৭টি সেন্টারে তালা ঝোলানো এবং প্রি-নেটাস ডায়াগনস্টিক টেকনিক্স (রেগুলেশন অ্যান্ড প্রিভেনশন অব্ মিসইউজ) আইনে ২৮ জন ব্যক্তিকে জেলে পুরেছে। ব্যাস, ওইটুকুই। যে সামাজিক ব্যাধি শিকড় গেড়েছে গোটা রাজ্যেই, তার মূলোৎপাটন না হলে হাল ফেরার আশা করছেন না কেউই।

চিঠিপত্র

অসম এবং

'স্বস্তিকা ৩০ সংখ্যা, ১১ এপ্রিল ২০১১-এ বাসুদেব পাল মহাশয়ের ''অসম বিধানসভা নির্বাচন : একটি বিশ্লেষণ''-এ অসমের বর্তমান পরিস্থিতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। এটি পড়ে ১৯৬০-এর দশকে বঙালখেদা আন্দোলনের কথা মনে পড়ল, এই আন্দোলনে 'আলী কুলি বাঙালী' এই ছিল স্লোগান।

বাঙালীদের ঠেকাবার জন্য ময়মনসিং থেকে মুসলমান আমদানি করে (যারা মাতৃভাষা অসমীয়া এই পরিচয় দেবে এই শর্তে)। সেই আলীরা এখন শিরোপরি। তাদের তাড়াবার জন্য চেষ্টা হয় পরে—যখন বাংলা ভাষী মুসলমানরা 'মাতৃভাষা বাংলা' বলে ঘোষণা করে (নেলীর ঘটনার পর থেকে), কারণ তখন কোমরে জোর হয়ে গেছে। যাইহোক অ গ প 'Cut off date' অর্থাৎ অনুপ্রবেশ মেনে নিয়ে কিন্তু অমুক তারিখের পর থেকে যে অসমে ঢুকেছে তাদের বহিষ্কার করতে হবে এই উদ্যোগ শুরু করে। সেই তারিখ নিয়ে দীর্ঘকাল বিতণ্ডা চলে। এ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে 'Cut off date' হবে ১৪.৮.১৯৪৭, যেদিন পাকিস্তানের জন্ম হয়, মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে বাস করতে পারবে না—কারণ তারা ওদের ঘৃণা করে ও হেয় করে। এবং প্রভুত্ব করে, যদিও ক্ষমতা তখন বৃটিশের হাতে। এই দাবীতে পাকিস্তান দাবী করে ও আদায় করে নেয় ওই ১৪ আগস্টই ১৯৪৭-এ। সুতরাং এরপর ওদের ভারতে ঢোকা ওদের মতেই নিষিদ্ধ।

অবশ্য বেশ কয়েক বছর পর, 'হিন্দুরা ঘৃণা করে, হেয় করে' এই তত্ত্বটা বদলে নতুন সুর ধরল—হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করছে ভারতে উন্নততর জীবন লাভের আশায়। মুসলমানরা সেসব করছে না। পরন্তু অনুপ্রবেশ চলতেই থাকে। সরকার দেখেও ঘুমিয়ে থাকে। এরও ১০/১৫ বছর পর আবার সুর বদল করে 'লেবেনস্রাউম' তত্ত্ব হাজির করে। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা, অসম, (পুরা ভারতই) ওদের 'স্বাভাবিক বিচরণভূমি'। ওরা ত যাবেই।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী হিসাবে স্বাধীনতার পর ৮ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৩৫ শতাংশ মুসলমান আছে (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কালে এক কোটি মুসলমান শুধু পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করে ও সদাশয় সরকার তাদের এখানেই নাগরিকত্ব দেয়, হিন্দুদের বিপন্ন করে)। অসমীয়া গবেষকরাই প্রমাণ করেছে বৃটিশ আমলে রাজকার্য পরিচালনায় সুবিধার্থে বাঙালীদের অসমে ডেকে আনে ও এজন্য অসমে বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দেয়। এবং অসমীয়ারা ভীত হয়, অসমে বাঙালীদের আধিপত্যের আশঙ্কায়। তখনকার কিছু বাঙালীর উন্নাসিকতা থাকলেও (বর্তমানে নেই) তারা বিপজ্জনক নয়। তারাই তখন প্রচার করেছিল বাঙালীরাই জোর করে অসমের ভাষা করেছে বাংলাকে। এখন অসমীয়রা বুঝেছে ধর্মীয় সংখ্যা গুরুত্বের জন্য বাঙালী তাড়ানো ঠিক নয়। বাংলা ও অসম এখন দ্রুত শত্রু কবলিত হবার আশঙ্কায়। সুতরাং অবিলম্বে বাংলা ও অসম থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কার অত্যাবশ্যক। ১৯৭১ এর মুক্তি যুদ্ধের, বাংলাদেশের ফলশ্রুতি হিসাবে পশ্চিমবাংলা কেন এক কোটিরও অধিক বাংলাদেশীকে গ্রহণ করবে? হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে এলে তাকে ভারত পুনর্বাসন দিতে বাধ্য। 'উপরন্তু ৫/৬ লক্ষ বিহারী মুসলিম, যারা বাংলাদেশে আটক পড়ে ছিল তারাও একে একে পশ্চিমবাংলায় পালিয়ে আসে। তাদেরও নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতে এখন ৪/৫ কোটি বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী বেআইনি ভাবে আছে। সরকার কখনও তাদের বহিষ্কারের চেষ্টা করে না। এমনকী তাদের সংখ্যাও প্রকাশ করে না। ভারতের মুসলমানদের যে এখন 'Pakistani Muslim in India' বলা হয় সেটা এমনি এমনি নয়, সরকারকে বাধ্য করতে হবে তার জন্য আমাদের সমবেত চেষ্টা চালাতে হবে।

বর্তমানে অনুমেয় অসমিয়া ও বাঙালী মুসলমান নিয়ে ওরাই সংখ্যাগুরু। আবার বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমান ভাষার দিক থেকে বাংলাই সংখ্যাগুরু। অসম ইতিমধ্যেই টের পাচ্ছে তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ওদের মুখাপেক্ষী। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই ওদের এত অধিক সুবিধা দিয়েছে যা অন্যদের ক্ষিপ্ত করতে বাধ্য। উভয় প্রদেশে ওরা সংখ্যাগুরু হলে আবার কি আমাদের বাস্তুচ্যুত হতে হবে? অসমে বাঙালী হিন্দুরা ভয়ে ওদের সেবা করছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের জন্য মাথা বিকিয়ে দিয়েছে। কম্যুনিস্টরা সোভিয়েট রাশিয়ায় যে শিক্ষা পেয়েছে, সেটা ইতিমধ্যে ভুলে গিয়ে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সেবা করছে। অথচ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ওদের অস্তিত্বও নেই। ক্ষমতা পেলে মুসলিমরা ওদেরই আগে বিলোপ ঘটাবে। তবুও কিছু হিন্দু যোগেন্দ্র মণ্ডলের শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে আবার ওদের খপ্পরে পড়বার চেষ্টা করছে। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় হিন্দুরা বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে এসে ইসলামের সেবায় নিরত। এদের চক্রান্তের ভয়ে আজ আমরা আশঙ্কিত।

—ভূপতি চরণ দে, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭৫।

মার্কিন ভূতের ছায়ায় ভয়ে কাঁটা আলিমুদ্দিন

সুজিত দে

'৯০-এর দশকের শুরুতে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট শাসন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। ইতিহাসের নিয়মেই বিদায় নিতে হয়েছিল মিখাইল গর্বাচেভ থেকে শুরু করে রোমানিয়ার চেসেস্কু—সবাইকেই। কিন্তু তারপরও কমিউনিস্টরা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যটাকে সত্য বলার সাহস দেখাতে পারেননি। কেন কমিউনিস্ট শাসনের বিপর্যয় তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেননি মার্কসের শিষ্যরা। বরং ইতিহাসের পরিবর্তনের নিয়মকে বা ধারাকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে তারা হাঁটতে চেয়েছেন।

সেদিনও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সেনা-ট্যাঙ্ক নামিয়ে জনগণের পরিবর্তনের ইচ্ছাকে আটকে দেওয়া যায়নি। এবারেও পশ্চিমবঙ্গে একই কায়দায় জনগণের ইচ্ছাকে নিজেদের বশে রাখার চেষ্টা করছে এই রাজ্যের শাসক শক্তি। আরও অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া গেল পরিবর্তনের এই শহরে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের জন্য সেদিনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালো হাত দেখতে পেয়েছিলেন কমিউনিস্টরা। ঠিক একই কায়দায় লালবাড়ির দখল ছাড়তে নারাজ বাংলার বামপন্থীরা পরিবর্তনের চেষ্টা ও অশান্তির আবহাওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। বলছেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কালো টাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বামেদের তাড়ানোর জন্য মাঠে নেমে পড়েছে এবং তাদের দোসর হয়েছেন মমতা। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মতো পশ্চিমবঙ্গেও বামপন্থীদের অনিবার্য পরিণতির পেছনে যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কাজ করছে সেই কঠিন সত্যকে তারা স্বীকার করতে নারাজ।

যুগোশ্লাভিয়ার প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি মিলোভান জিলাস্ নিজেই বলেছিলেন—কমিউনিস্ট ব্যবস্থার গোড়াতেই গলদ। এরা একটা বিশেষ ধরনের পার্টি ব্যবস্থা গড়ে তোলে। আর ওই পার্টি ব্যবস্থার গর্ভ থেকেই নতুন এক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। যে শ্রেণী সমাজের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। পরবর্তীকালে

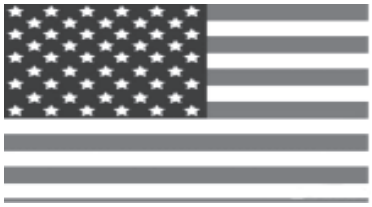

এর প্রমাণ মিলেছে পূর্ব ইউরোপ বা সোভিয়েত ইউনিয়নে। এর ফলে পার্টি সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতা দল ও সরকারকে অনিবার্য পতনের দিকে ধাবিত করে। যা থেকে বেরিয়ে আসার কোনও পথই থাকে না। এই টোটালিটেরিয়্যাল কোয়ার্সিভ মেথড বা সর্ব নিয়ন্ত্রণবাদী দমনমূলক ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা যখন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় তখন একটা রাজনৈতিক আবেগের উপর ভর করে সেই জাতি বা রাজ্য পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যায়। তখন তার কাছে অন্য কিছু ভেবে দেখার বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে চলমান ও ঘটমান রাজনৈতিক পালাবদলের এই ঝড়কে ইতিহাসের এই আঙ্গিকেই দেখা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে আজ যে পরিবর্তনের ঝড় উঠেছে, রাজ্য রাজনীতিতে যে ভাবে তৃণমূলের জয়ধ্বজা উড়ছে তার শেকড় কিন্তু চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনের গর্ভেই লুকিয়ে আছে। একদিকে চৌত্রিশ বছরের টানা বাম শাসনের হিংসা-সংস্কৃতি, পার্টির কমরেডের রক্তচক্ষুতে গাছের পাতা নড়া থেমে যাওয়া এসব তো ছিলই। কিন্তু যেটা সবাইকে অবাক করে দিয়েছে তা হলো, শিল্পায়নের নামে শিল্পপতিদের অন্ধ স্তাবকতা করা। প্রয়োজনে বুলেট দিয়ে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া, বিত্তবান শ্রেণীর মুখিয়াদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, প্রমোটাররাজ, তোলাবাজির নামে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা ইত্যাদি। বস্তুত বামপন্থা ও কমিউনিস্ট নীতি আদর্শের সঙ্গে যা বেমানান, সেই বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া চরিত্র এবং প্রতিবাদী কণ্ঠকে থামিয়ে দিতে স্ট্যালিনবাদী বর্বরতা— এ সবগুলিই 'প্রলেতারিয়েত' পার্টির প্রতিটি গ্রন্থিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাংলায় বামপন্থার এই বীভৎসতা দেখে নিচুতলার উপেক্ষিত- অবহেলিত-সন্ত্রস্ত মানুষ জবুথবু হয়ে ছিলেন। কারণ জনতার অব্যক্ত যন্ত্রণাকে যাদের ভাষা দেওয়ার কথা ছিল সেই বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি কোনদিনই নিজেদের এক সুতোয় গাঁথতে পারেননি। এই সর্বাত্মক পচনের মুখে দাঁড়িয়েও রাজনৈতিক ভাবধারা থেকে দীর্ঘ পথচলা ও বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গণ আন্দোলনের তুফান হয়ে বেরিয়ে এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই উঠল বাংলার রাজনৈতিক অচলায়তন ভাঙ্গার ঝড়। মানুষ সেদিন তাদের হৃৎপিণ্ডের অবিরত যন্ত্রণা আর রক্তক্ষরণকে ব্যালটের বাক্সে ভাষা দিতে শুরু করলেন। ২০০৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে যে ঝড় উঠল-তা ২০০৯-এর লোকসভার ভোটে আছড়ে পড়ল গাঙ্গেয় উপত্যকা সহ গোটা বাংলায়। থামল না ঝড়, বরং তা আরও গতি পেল গত বছরের পুরসভার নির্বাচনগুলিতে।

একের পর এক রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েও বামপন্থার ভেতরকার ঘুণে ধরা ব্যবস্থা-নিজেদের বিচ্যুতি, পুরোমাত্রায় বুঝতে চাইল না এদেশের বামপন্থীরা। বরং রাজনীতি-বিপ্লব-সংগ্রামের সারাটা জীবনই বামেরা আমেরিকার ভূত দেখে দেখে দিশেহারা। সেই ছেলেবেলা থেকেই বামেদের মুখে শুনে আসা—আমেরিকার কাছে দেশ বিক্রি করে দেওয়ার গল্প, দেশের অতন্দ্র প্রহরী বামেদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিলে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে পড়া—এই সস্তা কথাগুলো বাজারে তেমন বিকোয় না। পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে সমর্থন প্রত্যাহার ও লোকসভার ভোটের ফল দেখেও সেই অতন্দ্র প্রহরীরা কোনও শিক্ষাই নেয়নি। আসলে প্রদেশের মার্ক্সবাদীরা থিসিস-অ্যান্টি থিসিস-সিন্থেসিস সেই তত্ত্বকেও এখন মানতে নারাজ। মার্কসের লেখা দাস ক্যাপিটাল, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো—এদেশের তাত্ত্বিক বাম নেতারা কণ্ঠস্থ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেগুলি আর পরিপাক ক্রিয়ায় হজম করে তোলা যায়নি। ফলে মুখে মার্ক্সীয় দর্শনের কথা বলে। কিন্তু তাকে লালবাড়ির ক্ষমতার মোহ থেকে বার করে সমাজ-রাজনীতিতে রূপায়ণের প্রশ্নে বাস্তবের আলো দেখানো হয়নি। তাই সর্বহারার একনায়কতন্ত্র, সমাজ বদলের স্বপ্ন! শোষণহীন সমাজ গড়ার কথা হাততালি কুড়োনোর জন্য মেঠো বক্তৃতাতেই আটকে আছে। ফলে মার্ক্সবাদ ভুলে গিয়ে মার্কিন ভূতের ভয়ে থরহরি কম্প আলিমুদ্দিনের। **(সৌজন্যে : দৈনিক সংবাদ)**

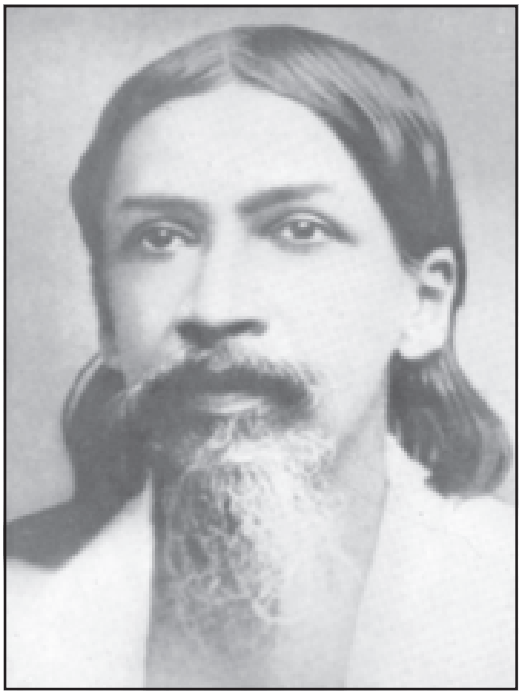

শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'

।। নির্মল কর।।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের সশস্ত্র সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা। অরবিন্দ ঘোষের জীবনদর্শন আচমকাই মোড় নেয় অন্যখাতে। দার্শনিক অরবিন্দ ছাপিয়ে যান সশস্ত্র সংগ্রামী অরবিন্দকে। তাঁর দর্শনের মূল কথাই তিনি লিপিবদ্ধ করেন 'সাবিত্রী' গ্রন্থে। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা এবং আত্মোপলব্ধির চরম প্রকাশই হলো 'সাবিত্রী'। এর রচয়িতাকে বিশ শতকের অন্যতম সূক্ষ্ম মননের অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা 'সাবিত্রী'র পংক্তি সংখ্যা ২৩ হাজার ৮৩৭।

'সাবিত্রী' একটি কাহিনী ও প্রতীক। মহাভারতের বনপর্বে সাবিত্রী কাহিনী আছে সাতটি অধ্যায়ে। সাবিত্রী ও সত্যবানের সূত্রটা শ্রীঅরবিন্দ মহাভারত থেকে নিলেও মহাকাব্যটি অনন্য হয়েছে প্রতীক ব্যবহারের ফলে। ভাগবত সত্যের বিবিধ রূপায়ণ তিনি দেখিয়েছেন 'সাবিত্রী'তে। ভগবানের কাছে মানবাত্মার নত হওয়া এবং নিয়তির বশ্যতা স্বীকার না করা। মৃত্যুঞ্জয়ী বাণীর প্রতীক হিসেবেই সাবিত্রীকে বরণ করেছেন বলে মৃত্যুকে যমরাজরূপে চিত্রিত করেননি--- নচিকেতার বরেণ্য যমদেব তো নয়ই, যাঁর যথেষ্ট জ্ঞানদীক্ষা পেয়ে নচিকেতা নচিকত অগ্নির প্রবর্তন করেছিল পৃথিবীর নিষ্প্রভ আর্ত জীবদের জন্য। কঠোপনিষদ-এ যমকে বরেণ্য দেবতা বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে তত্ত্বজ্ঞানের গুরুরূপে।

শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যু এক সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি' নবপ্রতীক। কিসের প্রতীক? অহংকারের বস্তুতান্ত্রিকতার বাঙ্ময় যৌক্তিকতার। সাবিত্রীকে অমরতার তথা ভাগবতী পরাশক্তির প্রতীক করে ফলিয়ে তুলতে চেয়েই মৃত্যুকে শ্রীঅরবিন্দ কল্পনা করেন তার পরম প্রতিপক্ষরূপে।

শ্রীঅরবিন্দের মতে সত্যবান হলো আত্মার প্রতীক। মৃত্যুর আঁধার রাজ্যে সে নেমে এসেছে। আর সাবিত্রী হলো দিব্য আলো জ্ঞানের প্রতীক---নেমে এসেছে মৃত্যুর কবল থেকে সত্যবানকে উদ্ধার করতে। অশ্বপতি হলো তপঃশক্তির প্রভু। দ্যুমৎ সেন হলো প্রোজ্জ্বল অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক। আদ্যাশক্তি সাবিত্রীকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর পরম দান হিসেবে। যোগী অশ্বপতির সাধনার উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীকে অজ্ঞান থেকে উদ্ধার করা।

'সাবিত্রী'কে বুঝতে হলে শ্রীঅরবিন্দের এই কথাটা মনে রাখতে হবে : কবিতার স্বর আসে আমাদের উপরের এক রাজ্য থেকে। আমাদের ব্যক্তিগত বুদ্ধির উপরের কোনও স্তর থেকে, সেখানে এক অতিমানস চেতনার প্রতি জিনিসের অন্তরতম ও বৃহত্তম সত্যকে দেখা যায় অধ্যাত্ম অভেদরূপে। তখন মনকে অন্ধকার করে এই অতিমানসের স্পর্শ, তার আবেগ এই দৃষ্টি ও শব্দকে নির্জকীয় করে নিয়ে সৃষ্টি করে কাব্য-প্রেরণার অন্তর অনুভূতি।

'সাবিত্রী' সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী মহাকাব্যের শেষে সংযোজিত হয়েছে। তার মধ্যে এক চিঠিতে কাব্যদর্শনের স্থান আছে কিনা সে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : অনেকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, যদি অতিরিক্ত চিন্তা করি এবং যখন আমি পদ্যে লিখে চলি, তখন চিন্তা এসে প্রবেশ করে তার মধ্যে এবং কবিত্বকে বহিষ্কার করে দেয়। পক্ষান্তরে আমার মত এই যে, দর্শনের স্থান আছে, এমনকী একটা প্রধান স্থানই থাকতে পারে আন্তর চেতনাগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে, যেমন গীতায়। সব নির্ভর করে জিনিসটি কীভাবে করা হয়েছে, শুষ্ক দর্শন, না জীবন দর্শন? একটা বুদ্ধিগত বিবৃতি না চিন্তাবৃত্তির যে-জীবন্ত সত্য, তারই শুধু প্রকাশ নয়, তার যে-সৌন্দর্য, যে জ্যোতি তারও বাঙ্ময় প্রকাশ? মানুষের মনকে ব্রহ্মাভিমুখী করতে 'সাবিত্রী' মহাকাব্য জগতের সর্বোত্তম শক্তিশালী শিল্প-রচনা বলে এক বিশিষ্ট সমালোচক মনে করেন। শ্রীমায়ের অভিমত হলো, 'সারাবিশ্ব শ্রীঅরবিন্দ মাত্র একটি বইতে ভরে দিয়েছেন। 'সাবিত্রী'র প্রতিটি লাইন যেন মন্ত্র। 'সাবিত্রী' হলো আধ্যাত্মিক পথ, তপস্যা ও সাধনা।

পরম্পরা

কর্মদাস হওয়ার বিড়ম্বনা

টেবিলে বসে কাজ করতে ভালোবাসেন অনেকেই, কিন্তু সেই ভালোবাসা মাত্রাছাড়া হলে তা শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক। একথা বলছেন বিদেশী শারীরবিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে তামাক খাওয়ার মতোই খারাপ একটানা টেবিলে বসে কাজ করার ব্যাপারটা। শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মন। মনের ক্ষতি তো বাকি থাকে না শরীর জখমের পর। আমাদের দেশের যত মানুষ টেবিলে বসে কাজ করেন তাঁদের সংখ্যা কম নয়। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের থেকে বেশি। আমাদের এখানে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয় অনেককেই। স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধিনিষেধ জানবার এবং মানবার গরজ সত্যিই কম। নিয়মকানুন মানতে চান অনেকে, কিন্তু পাশাপাশি যখন দেখেন আইনকে তাচ্ছিল্য করে একদল বেপরোয়া আচরণে অভ্যস্ত, তখন তাঁরা থেমে যান। ফলে কাজের পরিবেশ একদিকে যেমন নষ্ট হচ্ছে না-কাজের মাধ্যমে, অন্যদিকে কাজের অত্যধিক চাপ নেওয়ার ফলে কর্মীদের কর্মদক্ষতা, মনোযোগ কমে যাচ্ছে দিনে দিনে।

খবর একটু স্পষ্ট করে জানানো যাক। বলা হচ্ছে, যাঁরা একদশকের বেশি সময় প্রতিদিন দীর্ঘসময় কমপিউটার নিয়ে কাজকর্ম করছেন তাঁদের কাছে সমস্যাটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে যে কোন সময়ে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মাঝে মাঝে শরীরটা একটু নাড়াচাড়া করা দরকার। ঠায় বসে না থেকে মাঝেমধ্যে একটু উঠে দাঁড়িয়ে ঘোরাঘুরি করলে সমস্যা থেকে কিঞ্চিৎ রেহাই মেলে। আবার যত বেশিমাত্রায় কর্মপ্রেম থাকবে, ততই থেকে যাবে ঝুঁকি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, যাঁরা কমপিউটারের মনিটারে চোখ রেখে কাজ করছেন তাঁদের হৃদয়ের ক্ষতি হচ্ছে। কারণ সরাসরি হৃদযন্ত্রের উপর চাপ পড়ে। ক্রমাগত চাপ পড়লে স্থায়ী সমস্যা দেখা যায় হৃদযন্ত্রের। মেয়েদের মধ্যে অনেকে ১১ ঘণ্টা একটানা কাজ করেন কমপিউটারে। তাতে কোমরে ক্রমাগত মেদ জমে বলয় আকারে। সেটি মোটেই সুদৃশ্য নয়। এবং জানিয়ে দেয় শরীরে ঝুঁকি বাড়ছে। তাছাড়া কমপিউটারের সামনে বসে অনেকেরই অভ্যেস নানারকম এলোমেলো খাবার খাওয়ার। তাতে ভালোরকম ক্ষতি হয়। কমপিউটারের মনিটারে চোখ রেখে অনেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান। দুপুরে খেতে পর্যন্ত ভুলে যান। কমপিউটার নিয়ে প্রয়োজনের কাজ করা একরকম আর তার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার ব্যাপারটা শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক। তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন এরকম ঝুঁকি নিয়ে। কাজ করতে করতে একটু উঠে ঘোরা কিংবা হাত পা নাড়াচাড়া করলে সমস্যা কিছুটা কমে।

মধ্যবয়স্ক কর্মীদের মধ্যে যাঁরা সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা কাজ করেন তাঁদের মানসিক-দক্ষতা কমে যায়। স্মৃতিশক্তিও হ্রাস পায়। সেক্ষেত্রে দিনে যাঁরা ৪১ ঘণ্টা কাজ করছেন তাঁদের মানসিক দক্ষতা ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায় একটু কম। শারীরবিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিতেন, শুধু কাজ নিয়ে মেতে থাকা মানেই শরীর মন জখম হওয়া। কাজের চাপ থাকবেই। কিন্তু চাপকে সহজভাবে নিতে না পারলে সমস্যা দেখা দেবে। ভাজাভুজি খাদ্য ঠিকই, কিন্তু শুধু তা দিয়ে উদরপূরণে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়ে যায়। কমপিউটার প্রয়োজনের জিনিস, কিন্তু তা নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতিতে অনেকরকম অসুখ দেখা দিতে পারে। এবং দিচ্ছেও। অসুখ ঘিরে ধরছে ক্রমাগত। পাকস্থলি কোলনের ক্যানসারের পরিমাণ বাড়ছে। ওজন বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু মেদ যে মেধা কমাতে পারে—এটা অনেকে বুঝতে চান না। কিংবা পারছেন না।

কমপিউটারের সম্বন্ধে এতকথা বলার প্রয়োজন হচ্ছে কারণ সব কাজের জায়গায় কমপিউটার ঢুকে গেছে। আগে যখন কমপিউটার ছিল না কাজের অন্যরকম পদ্ধতিতে পরিশ্রম হোত। কিংবা কাজের একঘেঁয়েমি থেকে রেহাই পাবার জন্যে নানাদিকে মন যেত। কয়েক ঘণ্টা কাজের পর সেজন্যে বিরতি থাকার নিয়ম ছিল। বিরতির সময় কাজের জায়গা ছেড়ে চলে যেত হোত সকলকে। আধ ঘণ্টা/এক ঘণ্টা অন্যত্র কাটিয়ে তাজা মন নিয়ে টেবিলে ফেরার মধ্যে দুটো জিনিস ঘটত—১. কর্মদক্ষতা বজায় থাকত, ২. শরীর মন কিছুটা বিশ্রাম পেত। কিন্তু এখন নিয়োগকর্তারা এমনভাবে কাজের ছক করেন যাতে অল্প বেতনে অনেক বেশি কাজ আদায় করা যায়। চাপ সৃষ্টি চলে ক্রমাগত। কাজ ঠিক সময়ে করতে না পারলে নিয়োগকর্তারা অখুশি। কর্মীদের ভয় থাকে, অদক্ষতার অজুহাত দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপার ঘটতে পারে। সেজন্যে শরীর মন ক্লান্ত হয়ে পড়লেও ছুটতে বাধ্য হন তাঁরা। তরুণরাও কাজের টানে ছুটে চলেছেন। কমপিউটার তাদের এমনভাবে ঘিরে ধরেছে যা পুরোপুরি শুষে নিচ্ছে। হৃদয়হীন যন্ত্রের দাস হয়ে মস্তিষ্ক আর হৃদয়ের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি শরীরের বিভিন্ন অংশের। কাজ করা জরুরি, কিন্তু কর্মদাস হলে তা একসময় শরীর মনকে এমনভাবে কাবু করবে যা থেকে নিস্তার মিলবে না সহজে। তাই শারীরবিজ্ঞানীরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন বার বার।

মগজচর্চা

১। কোন্ নোবেল-বিজয়ী ১৯১৭ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক ছিলেন?

২। কোন্ প্রথম বাঙালি বহু-ভাষাবিদ, যিনি ৩৪টি ভাষায় অনর্গল লিখতে পড়তে জানতেন?

৩। স্বাক্ষর ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কোন্‌টি?

৪। কোন্ বিশ্ববিশ্রুত কবি ও নাট্যকার প্রথম জীবনে লণ্ডনের গ্লোব থিয়েটারে গাড়ি পাহারা দিতেন?

৫। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট খেলতে নামা প্রথম মুসলিম ক্রিকেটারের নাম কী?

—নীলাদ্রি

উত্তর—

১। চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন

২। হরিনাথ দে

৩। 'ভারতভূমি'—১২৮০ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত

৪। উইলিয়াম শেক্সপিয়র

৫। ওসমান খোয়াজা

রঙ্গকৌতুক

নাসিরুদ্দিন সরাইখানায় ঢুকে গম্ভীর মুখে বললেন, 'সূর্যের চেয়ে চাঁদের উপকারিতা অনেক বেশি।'

'বলেন কি মোল্লা সাহেব, সূর্যের সঙ্গে তুলনা!'

'নিশ্চয়, চাঁদ আলো দেয় রাত্তিরে, দিনে আলো দেওয়ার দরকারটা কী সূর্যের?'

***

—প্রাইমারি শিক্ষক সংসদের নির্বাচনে সিপিএম নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছে। তার মানে পার্টি ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

—সে তো 'প্রাথমিক' ভাবে। এর পর মাধ্যমিক, তারপর উচ্চ মাধ্যমিক... আছে তো!

***

নাতি ঃ দিদু, হোমওয়ার্কে 'এসে' লিখতে দিয়েছে। বর্সা স্পেলিং কী হবে?

দিদু ঃ মাথায় পড়লে 'ষ', বুকে বিঁধলে 'শ'।

***

শিক্ষক ঃ পাঁচটি দুগ্ধজাত পণ্যের নাম কর।

ছাত্র ঃ মাখন, ঘি, আর তিন টুকরো পনির।

***

একটি দোকানে বিজ্ঞপ্তি ঃ অন্য কোথাও গিয়ে প্রবঞ্চিত হবেন না। আমাদের কাছেই আসুন।

—নীলাদ্রি

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

গ্লুকোওয়াচ

'গ্লুকোওয়াচ' নামে এই বিশেষ ঘড়িটি হাতের কব্জিতে বাঁধা থাকলে শরীরের শর্করার পরিমাপ জানা যাবে। বিজ্ঞানীরা চাইছিলেন সূঁচ না ফুটিয়ে শরীরের সুগার মাপতে। 'নাসা'র মহাকাশচারীদের জন্য প্রয়োগ করা কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণা করে বিজ্ঞানীদের এই উদ্ভাবন। জ্বালা যন্ত্রণা ছাড়াই গ্লুকোওয়াচের সাহায্যে রোগীকে আশ্বস্ত করা যাবে। কারণ, এর দ্বারা রোগী নিজেই শর্করার পরিমাণ জেনে নিতে পারবেন।

সারবে আপনিই

শরীরের ক্ষয়ে যাওয়া অংশ নিজে থেকেই গজাতে পারে। ফিলাডেলফিয়ার বিজ্ঞানীদের দাবি, পি-২১ জিন অচল করে দিলেই এটা সম্ভব। বিবর্তনের ফলে কয়েকটি উভচর বাদে সব প্রাণীর ক্ষেত্রেই পি-২১ কাজ করছে। প্রাণীদেহের ওই জিনের ক্রিয়া বন্ধ করার পরে ইঁদুরের কাটা-কান নতুন করে গজিয়ে উঠেছে বলেও দাবি করেছেন লন্ডনের ওয়াইস্টার ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা।

প্রথম কৃত্রিম কিডনি

বিশ্বের প্রথম সংস্থাপনযোগ্য কৃত্রিম কিডনি আবিষ্কার করলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী শুভ রায়। ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগের দেহে সফল কিডনি প্রতিস্থাপনের পর তিনি নিশ্চিত যে, যাঁরা জটিল কিডনির রোগে ভুগছেন, তাঁদের আর ডায়ালিসিস করতে হবে না। অধ্যাপক রায় জানিয়েছেন, এই কৃত্রিম কিডনি শরীরের বিষাক্ত বর্জ্য নিষ্কাশনে সাহায্য তো করবেই, উপরন্তু সাহায্য করবে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং হাড় ও দাঁতের গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন ডি সংশ্লেষের ক্ষেত্রে।

স্বপ্ন দেখুন স্মৃতিশক্তি বাড়ান

এমনটাই উপদেশ দিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডঃ সারা মেডনিক। ঘুমের একটি বিশেষ পর্যায় র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট-এ মানুষ স্বপ্ন দেখে। ঘুমের এই পর্যায় স্মৃতি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাল স্মৃতিশক্তি মানুষকে ভবিষ্যৎ দেখতেও সাহায্য করে। কারণ স্মৃতিই আমাদের মস্তিষ্কে ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

পরলোকে শ্যামাপ্রসাদ-দুহিতা সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৩০ এপ্রিল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ডাকনাম 'বুয়া') জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর। তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা মঞ্জু-র সঙ্গে একই বাড়িতে (কিন্তু আলাদা ফ্ল্যাটে) পুণে-তে থাকতেন। তাঁর অন্য সন্তান পুত্র অনুপ বর্তমানে শিকাগোতে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) থাকেন। তাঁর স্বামী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বেই প্রয়াত। শ্যামাপ্রসাদের অন্য সন্তানদের মধ্যে দুই পুত্র অনুতোষ এবং দেবতোষও জীবিত নেই। একমাত্র কনিষ্ঠা কন্যা আরতি (হাসি) জীবিত আছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্যের রেগো পার্কে থাকেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশিষ্ট লেখক তথা রাজ্য বিজেপি-র অন্যতম নেতা তথাগত রায় বর্তমানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি সম্পূর্ণ জীবনী রচনারত এবং এজন্য তিনি ''ডঃ মুখার্জী স্মৃতিন্যাস'' থেকে বরাতও পেয়েছেন। এই উপলক্ষে তিনি গত বছর পুণে-তে সবিতা দেবীর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলেন। সে সময় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন, এবং দীর্ঘ সময় ধরে সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন। ব্যক্তি ও পিতা শ্যামাপ্রসাদের পরিচয়ের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ্য। ওঁর বিয়ের সময় হঠাৎ উনি দেখেন শ্যামাপ্রসাদ নেই। খনিকক্ষণ পরে ফিরে এলেন। পরদিন যখন শ্যামাপ্রসাদ ওঁকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে গেছেন তখন সবিতা অভিমানে বললেন, ''বাপী, আমায় আপনি ছোঁবেন না, কালকে বিয়ের সময় আপনি ছিলেন না''। শ্যামাপ্রসাদ হেসে বললেন, ''মা, তুমি শ্যামাপ্রসাদের মেয়ে, তোমার এরকম করে কথা বলতে নেই। কালকে আমি কয়েকজন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে খাওয়াচ্ছিলাম, তাদের মুখের চেহারা যদি তুমি দেখতে''! উল্লেখ্য, সে সময়টা ১৯৪৩ সাল (বাংলা ১৩৫০) যখন 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বা দুর্ভিক্ষ চলছে।

গত ২০১০ সালে মহাজাতি সদনে আয়োজিত ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত এক অডিও-ভিস্যুয়ালে তিনি তাঁর পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সকলকে দেশ ও জাতির সেবায় কাজ করার আহ্বান জানান। তার প্রয়াণে দেশ এক সু-সন্তানকে হারাল।

সমাবেশ সমাচার

হোমিওচিকিৎসক সম্মেলন

প্রাণবন্ত জীবনীশক্তিই রোগ প্রতিরোধের প্রকৃত তত্ত্ব বলে উল্লেখ করলেন ভারতীয় হ্যোমিওপ্যাথিক সমাজের সভাপতি ডাঃ সুকুমার মণ্ডল। গত ১০ এপ্রিল কলকাতার শুভসদনে অনুষ্ঠিত হ্যোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে এসে তিনি এই মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী শুদ্ধ-সাত্ত্বিক জীবনযাত্রা, পরোপকারের চিন্তা ইত্যাদি জীবনীশক্তিতে সতেজ তথা প্রাণবন্ত করে তোলে এবং এর ফলেই মানব শরীর সুস্থ তথা কর্মচঞ্চল থাকে, মনে থাকে উৎসাহ-উদ্যম। হ্যোমিওপ্যাথির জনক হ্যানিম্যান এবং হ্যোমিওচিকিৎসক তথা দার্শনিক জেটি কেন্ট-এর বক্তব্য উল্লেখ করে ডাঃ মণ্ডল বলেন, যেদিন থেকে মানুষ আত্মস্বার্থ নিয়ে মগ্ন থেকে পরোপকার তথা প্রতিবেশীসুলভ আচরণ যথাযথভাবে পালন করতে ভুলেছে, সেদিন থেকেই মানুষের মনে শুরু হয়েছে রোগের বীজ বপনের পালা। ঈর্ষা, হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থপরতা ইত্যাদির প্রভাবই প্রকারান্তরে প্রাণবন্ত জীবনী শক্তির রাশ টেনে তাকে করে তোলে দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা রোগ-ব্যাধির জীবাণুগুলি শরীরে বাসা বাঁধার পথ করে নেয় এখান থেকেই। তাই শুদ্ধ-সাত্ত্বিক জীবন-ই রোগ প্রতিরোধের প্রকৃত দাওয়াই বলে স্পষ্ট উল্লেখ করেন ডাঃ মণ্ডল। এদিন মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে সকাল দশটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় দেড়শো চিকিৎসক শুভানুধ্যায়ী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ধূলাগড়ীতে স্বস্তিকা'র পাঠক সম্মেলন

গত ১৬ এপ্রিল হাওড়া জেলার ধূলাগড়ীতে স্বস্তিকা'র পাঠক সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার প্রমুখ রোহিনী প্রসাদ প্রামাণিক, স্থানীয় একটি পত্রিকার লেখক পাঁচুগোপাল ঘোষ এবং সঙ্ঘের হাওড়া জেলা প্রচারক অর্জুন মণ্ডল। বেশ কয়েকজন পাঠক স্বস্তিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সমাজ পরিবর্তনে স্বস্তিকার গুরুত্ব এবং অধিকাধিক মানুষের কাছে স্বস্তিকা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বক্তব্য ও আবেদন রাখেন রোহিনী প্রসাদ প্রামাণিক। উল্লেখ্য, ওইদিনেই বেশ কয়েকজন স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহক হন এবং সকলেই স্বস্তিকার প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির শপথ গ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সঙ্ঘের হাওড়া জেলা প্রচার প্রমুখ শুভেন্দু সরকার।

বঙ্কিম প্রণাম

গত ২৮ এপ্রিল নৈহাটির স্থানীয় ছাত্র, শিক্ষক, বিশিষ্ট নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ মিলিতভাবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনে যান এবং সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। ওই স্থানে রাধাবল্লভের মন্দির প্রাঙ্গণে প্রার্থনা, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কিত আলোচনা হয়। সাইকেলে চেপে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে কাঁচড়াপাড়া থেকে নৈহাটিতে আসেন স্বয়ংসেবকরা।

শীতলা ও রক্ষাকালী পূজা

মোমিনপুর বারোয়ারী সমিতি গত ২৩ এপ্রিল মোমিনপুর বিন্দুবাসিনী শীতলা মন্দিরে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও শীতলা পূজা করে। পূজা অনুষ্ঠানে বাইরে থেকেও বহু ভক্ত মায়ের পূজায় অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যার সময় মন্দির প্রাঙ্গণে ভোগের ব্যবস্থা হয়। পূজার পর শ্রীশ্রী শীতলা মায়ের পালাগান অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা থেকে আসা 'নতুন দল স্পোর্টিং ক্লাব' দলের পালাগান ভক্তদের মুগ্ধ করে। রাত্রি ১২টার পর রক্ষাকালী পূজা হয়। চাল কুমড়া বলি হয়। রাত্রি চার ঘটিকায় রক্ষাকালীর বিসর্জনের উদ্দেশে যাত্রা করে। ১২৫৮ বঙ্গাব্দে স্থাপিত এই দেবস্থান ওইদিন তীর্থস্থানে পরিণত হয়। সকাল-সন্ধ্যায় পূজায় অংশগ্রহণ করেন পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তী, মনমোহন চক্রবর্তী ও সিদ্ধার্থ পতি। মোমিনপুরের এই দেবস্থান অতুলনীয়।

নেহরু-গান্ধী পরিবারের জাতি-ধর্ম গোপন থাকবে কেন?

শিবাজী গুপ্ত

নিজের নাম ঠিকানা, বাপের নাম, ধর্ম ও জাতি বুক ফুলিয়ে প্রকাশ করাই মানুষের ধর্ম। কিন্তু যাদের জাতে ও ধর্মে ''কুছ্ কালা হ্যায়''—তারাই এসব তথ্য প্রকাশে থতমত খায় বা গোপন করতে চেষ্টা করে। দেশের এক নম্বর পরিবার অর্থাৎ ১০নং জনপথবাসিনীর ও তার সন্তানদের প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস কি তা জানতে চেয়ে Right to Information Act-এর ধারা বলে একজন আবেদন করেছিলেন এবং সর্বোচ্চ আদালত সে আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন।

খবরে প্রকাশ হরিয়ানা রাজ্যের প্রাক্তন ডিজিপি সি. পি. সি. ওয়াধয়া ভারত সরকারের আদমসুমারি রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে জানতে চান বিগত লোকগণনাকালে সোনিয়া গান্ধী ও তার ছেলেদের আচরণীয় ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার সে আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়—কারণ, তা প্রকাশ করলে নাকি রাজনীতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পারিবারিক গোপনীয়তা সাধারণ্যে প্রচার হয়ে পড়বে। তার অর্থ, নেহরু-গান্ধীদের পরিবারের গোপন কেচ্ছা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তা যাতে না হয়, সে চেষ্টা বানচাল করতে সরকার বদ্ধপরিকর। আর সে কারণেই এই নিষেধাজ্ঞা। মোট কথা নেহরু-গান্ধী পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের জাত-ধর্ম সম্পর্কে লুকোবার মতো কিছু আছে বলেই তারা তা দেশবাসীকে জানাতে চায় না। কিন্তু দেশবাসীর জানতে বাকী নেই যে নেহরু বংশের সঙ্গে মোগলদের পারিবারিক সম্পর্ক মোগল সম্রাট ফারুখ শাহর আমল থেকেই অব্যাহত। স্বয়ং জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন ও জন্মস্থান সম্পর্কেও গড়বড় রয়েছে। আর তিনি তো স্বহস্তেই লিখে গেছেন যে, তিনি শিক্ষায় ইংরেজ, সংস্কৃতিতে মুসলিম এবং দুর্ঘটনাবশত হিন্দু বলে পরিচিত।

তার পরবর্তী ধাপে তার মেয়ে সাদি করেছে মুসলমান ফিরোজ খাঁকে। তাদের বড় ছেলে রাজীব গান্ধীর বিবাহ হয়েছে খৃস্টানী সোনিয়া মাইনোর (বর্তমানে গান্ধী) সঙ্গে। খৃস্টান বাবা-মার সন্তান রাহুল গান্ধী তো নিঃসন্দেহেই খৃস্টানের সন্তান—তা যতই সে কপালে সিন্দুর ফোঁটা দিয়ে নকল হিন্দু সেজে ভোট ভিক্ষা করুক না কেন। ফলে, হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান—এই তিন ধর্ম ও রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে যে পরিবারে তারা জাতি-ধর্ম গোপন করবে না তো কি! ঝুলি থেকে যাতে বিড়াল বেরিয়ে না পড়ে তাই সরকারী মহলে

এই পরিবারের জাতি-ধর্ম লুকিয়ে রাখার এত ব্যাকুলতা।

কিন্তু কোর্ট কাছারী তো কোনও পরিবারের আজ্ঞাবহ ভৃত্য নয়। প্রথমে পাঞ্জাব হরিয়ানা হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রীম কোর্ট ও 'family privacy'র ধুয়া দিয়ে গান্ধী-নেহরু বংশধরদের ধর্মবিশ্বাস গোপন রাখার পক্ষে সায় ও রায় দিয়েছে। সে তথ্য সরকারী নথিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, তা জনসাধারণের কাছে গোপন রাখার সার্থকতা কি? যদি না—দেশবাসীর চোখে ধুলা দেবার মতো কিছু গোপন তথ্য থাকে। হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট এ ব্যাপারে যে ছেঁদো যুক্তি দেখিয়েছে তা পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে সংবাদপত্র থেকে হুবহু তুলে ধরা গেল ঃ

SC dismisses plea on disclosure of religion of Sonia Gandhi

New Delhi, 18 April : The Supreme Court today dismissed the plea of an RTI applicant seeking disclosure of "religion and faith" of UPA chairperson Mrs. Sonia Gandhi and her Children under the Right to Information Act.

A Bench of justices Mr. R V Raveendran and Mr. A K Patnaik upheld the Punjab and Hariyana High Court order which had said that such informations cannot be revealed as it would amount to encroachment of their privacy. The Bench dismissed the appeal of former Haryana DGP Mr. P C Wadhwa seeking details of religion and faith mentioned by Mrs. Sonia Gandhi and her children during the last census under the RTI from the Central Public Information Officer (CPIO) of the officer of Registrar General, Census Operations, under the Union Home Ministry. Senior advocate Mr. M N Krishnamani, appearing for the petitioner, pleaded that there was nothing wrong in disclosing such information by the goverment as they were public figures, who had projected certain public image regarding their religion and faith.

Mr. Wadhwa had first approached the Central Information Commission (CIC) after the government refused to part away with the information but it was rejected in year 2008. He then moved the High Court which also refused to give any relief to him and dismissed his plea. The High Court, while passing the order in November last, had said, "It is evident that the petitioner is making efforts to make unjustified inroads into the privacy of the individuals even if they are public figure and consequently the information cannot be made public." **PTI**

(The Statesman, 19.4.11)

এ বিষয়ে একটি গ্রাম্য উপমা উদ্ধৃত করে আলোচনায় ইতি টানা যাক—

চাষার ছেলে গুণী হলে পালায় দেশ ছেড়ে
বেশভূষা করে দুরস্ত।
করে বাপকে গোপন, জাতকে গোপন,
বিদেশে পরিচয় দেয় কায়স্থ।।

নেহরু-গান্ধী পরিবারের সদ্যসদেরও জাতি-ধর্ম গোপন করার পেছনে কোনও রহস্য আছে কি?

বাংলার যাত্রাপালার বিষয় নিয়ে সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী

দেওয়ালপঞ্জী লোকার্পণ করছেন শান্তিগোপাল।

।। বিকাশ ভট্টাচার্য।।

আমাদের ঐতিহ্য, পরম্পরা সাধারণের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে বিগত দু'বছর ধরে অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার ভারতী বাংলা নববর্ষে এক অভিনব দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশ করে আসছে। বারো মাসের বারোটি পৃষ্ঠায় একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা বা বিবিধ পূজাপার্বণের হদিশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্য ও পরম্পরার কোনও একটি বিশেষ দিক এতে তুলে ধরা হয়। ইতিপূর্বে ভারতের উন্মেষ, বাংলার বারোমাসে তেরো পার্বণ, বিভিন্ন রাজ্যের লোকনৃত্য, বাংলার নাট্যপ্রবাহ— এমনই কোনও বিষয় বাংলা ও ইংরেজী ক্যাপশনের সঙ্গে ছবিসহ তুলে ধরা হয়েছে। এ বছরের থিম বাংলার যাত্রাপালা।

বাংলার যাত্রাপালার সূচনা হাজার বছর আগে। ষোড়শ শতকে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদাবলীর পালারূপ দিয়ে চন্দ্রশেখর আচার্যের আঙিনায় শ্রীচৈতন্যদেব যে অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন তাকেই বাংলা যাত্রাগানের আদিরূপ বলে ধরা হয়। খৃস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকেই কৃষ্ণযাত্রার প্রচলন আমরা দেখতে পাই। তারপর ধীরে ধীরে যাত্রা হয়েছে থিয়েট্রিক্যাল। চারণ কবি মুকুন্দ দাস যেমন পরাধীন ভারতে তাঁর যাত্রাপালার মাধ্যমে দেশাত্মবোধ তুলে ধরেছেন, পরবর্তী সময়ে ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর শিক্ষা, রুচি ও শিল্পবোধে যাত্রাপালা রচনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। এ বছরের দেওয়ালপঞ্জীতে আমরা বাংলা যাত্রাপালার সেই বিবর্তনকে ধরতে চেয়েছি। রামানুজ, হর-পার্বতী, সিরাজদ্দৌলার মতো পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পালার ছবি যেমন আছে, তেমনি বাঙালি, সোনাই দিঘি, কবি, মাইকেল, নটীবিনোদিনী প্রভৃতি সামাজিক পালার ছবিও আছে। আছে পালাকার, গীতিকার, সুরকারদের কথাও। আছে যাত্রাদলের মালিকদের কথাও। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহায়তায় সংস্কার ভারতী এই দেওয়ালপঞ্জীর পরিকল্পনা ও রূপায়ণে সফল হয়েছে। গত ৯ এপ্রিল শনিবার সাড়ে পাঁচটায় পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহে এই বহুবর্ণ দ্বিভাষিক সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ করলেন সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা অনুপকুমার মতিলাল। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যাত্রাজগতের শান্তিগোপাল, শ্যামল ঘোষ, তপন গঙ্গোপাধ্যায়, সুরকার প্রশান্ত ভট্টাচার্য ও প্রভাত কুমার দাস।

চিত্র সমালোচনা

টেলিছবি
খোলা 'জানলা', বন্ধ চোখ

মিতদ্রু দত্ত

টেলিছবিটির নাম সংক্ষেপে 'জানালা'। ছবির নাম ছোট্ট করতে চেয়েছেন পরিচালক, খোলা জানালা বন্ধ চোখ, আমরা যারা অন্ধ তারা জানালা খুলেও দেখতে পাই না। অন্ধের এ দেশে চশমা বিক্রি করা যে কী কঠিন কাজ তা আমরা অনেকেই জানি না। আর আমাদের এই না-জানা কে জানাতেই পরিচালক রাজা বসু হাত দিলেন এমন এক টেলিছবি নির্মাণে যার নাম 'জানালা।' জানালা দিয়ে আমরা বাড়ির বাইরেটা দেখতে পাই। বাইরের দৃশ্য যদি হয় রক্তাক্ত, লাশ শুধু লাশে ভরা, তাহলেও কি জানালা খোলা রাখা যায়? এই সব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েই দিতে এ ছবি বানাচ্ছেন তিনি। বাংলার ঘটমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার করুণ ছবিটাই জানালায় দেখাতে চেয়েছেন পরিচালক রাজা বসু। কাহিনীটি মূলত এইরকম— একটি পরিবারের চার সদস্য-বাবা-মা, এক ছেলে ও এক মেয়ে। তারা সবাই মিলে বেড়াতে গেছে দিন সাতেকের জন্যে তাদের মামার বাড়িতে পশ্চিম মেদিনীপুরের কোনও এক গ্রামে। রাজনৈতিক সংঘর্ষ আচমকা শুরু হয়ে যায়। তারা পড়ে মহাবিপদে। সবেমাত্র মামার বাড়ি এসেই কলকাতায় ফিরে যাওয়া যায় না। অথচ প্রতিদিনই বোমা, গুলির লড়াই চলছে দু-পক্ষের। জানালা খুললেই বেওয়ারিশ লাশের সারি। মৃত্যুর যে এত ভয়ংকর রূপ হতে পারে আমরা তা ভাবতেও পারি না! তা দেখে পিকু আর চিকু। বছর সতেরো আর আঠারোর তরুণ-তরুণীর কীরকম মানসিক বিপর্যয় ঘটল তা নিয়েই ছবি। তারা আচমকা বারান্দার জানালা দিয়ে দেখে ফেলে একদল মানুষ কীভাবে আরেক দলের মানুষকে হত্যা করছে। দয়া নেই, মায়া নেই। শুধু টাকার খেলা! মানুষ মারার নির্লজ্জ, ক্লীব, উন্মত্ততার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তা দেখে তারা ভালো করে খেতে পারে না। পড়াশোনায় মন বসাতে পারে না। বারবার তাদের মনে আসতে থাকে শুধু সেই দৃশ্যের কথা। তারপর... কী হলো জানতে হলে দেখতেই হবে। অভিনয়ে আছেন দোলন রায়, দীপংকর দে, দেবাশিস বসু, গৌতম চৌধুরী, লোপামুদ্রা ভৌমিক, অনুরাধা রায়, অনামিকা সাহা, রীতা কয়াল প্রমুখ। সংগীতে আছেন ইন্দ্রাণী সেন। পরিচালনায় রাজা বসু সার্থক, নবীন পরিচালক। বয়সেও তরুণ তবু তার মধ্যেও ভাল কাজ দেখানোর সুযোগ পেলেন তিনি। ছবির কাজপ্রায় শেষ। ছবিটি শেষ হয় মানসিক রোগ চিকিৎসকের ক্লিনিকে। বাবা মা নিয়ে যান তাঁদের সন্তানদের। এর পর পর্দায় দুটি লাইন ভেসে উঠেছে নিঃশব্দে 'নাঃ! আর নয়।' চমৎকার বিষয় ভাবনা, বুদ্ধিদীপ্ত ও সংযত অভিনয়ে সবার মন কেড়েছেন কলাকুশলীরা। এক কথায় অনবদ্য। আপাত সুখের সংসারে কী ভাবে এল অ-সুখ, তা নিয়েই ছবি। এ সমাজে যারা রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালায় তারা কি জানে তার চরম পরিণতির কথা। আমরাও তা জানতে চাই না, জানি না। তাই তো এ ছবি।

শব্দরূপ-৫৮১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়াঁ

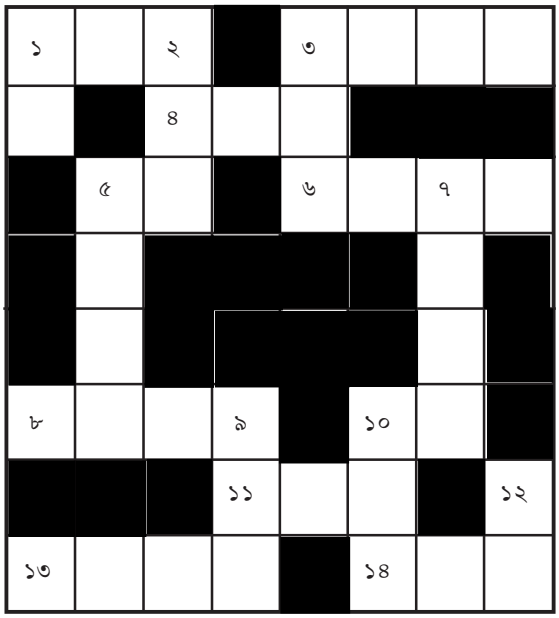

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. নাস্তিকতা এবং ঐহিক সুখভোগ প্রতিপাদক দর্শনকার মুনি, **৩.** কুবেরের উদ্যান, **৪.** পিধানে বা কোষে রক্ষিত, কোষবদ্ধ, **৫.** পরামর্শ, সরু কাঠি, **৬.** ''যত দোষ,—'' **৮.** শিক্ষানবীশের শিক্ষাকালের বৃত্তি, ছাত্র-বৃত্তি, **১০.** দক্ষের কন্যা, পতিব্রতা স্ত্রী, **১১.** বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র, আগা-গোড়া ধ্বনি, **১৩.** রামায়ণে উল্লিখিত যে অস্ত্রের নিক্ষেপে শত্রুসেনা ঘুমাইয়া পড়ে, **১৪.** অশ্বারোহী সৈন্যদল।

উপর-নীচ ঃ ১. নীলকণ্ঠ পাখি, **২.** কামধেনু, আগা-গোড়া কদলী **৩.** টিকি, **৫.** রাবণের অস্ত্রবিশেষ যার আঘাতে লক্ষ্মণ হতপ্রায় হইয়াছিলেন, **৭.** উদয়ন রাজার বীণা, **৯.** অস্ত্রবিহীন, **১০.** এক প্রকার কলা, চাটিমকলা, **১২.** নীলকান্ত মণি।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৭৯
সঠিক উত্তরদাতা

অভীক দেব
কলকাতা-৩
প্রশান্ত দাস
খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুব
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	প্র	তী	কো	পা	স	না
ব্যা	পি	কা	■	■	■	ং	■
পা	■	র	মে	শ	■	শ	■
দ	হ	■	■	ষ্ণু	■	প্ত	■
■	ল	■	রা	■	■	ক	মা
■	ফ	■	হু	তো	ম	■	র্ত্ত
■	না	■	■	■	ক	র	ন্ড
কা	মা	র	পু	কু	র	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৮১ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩০ মে, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ৪

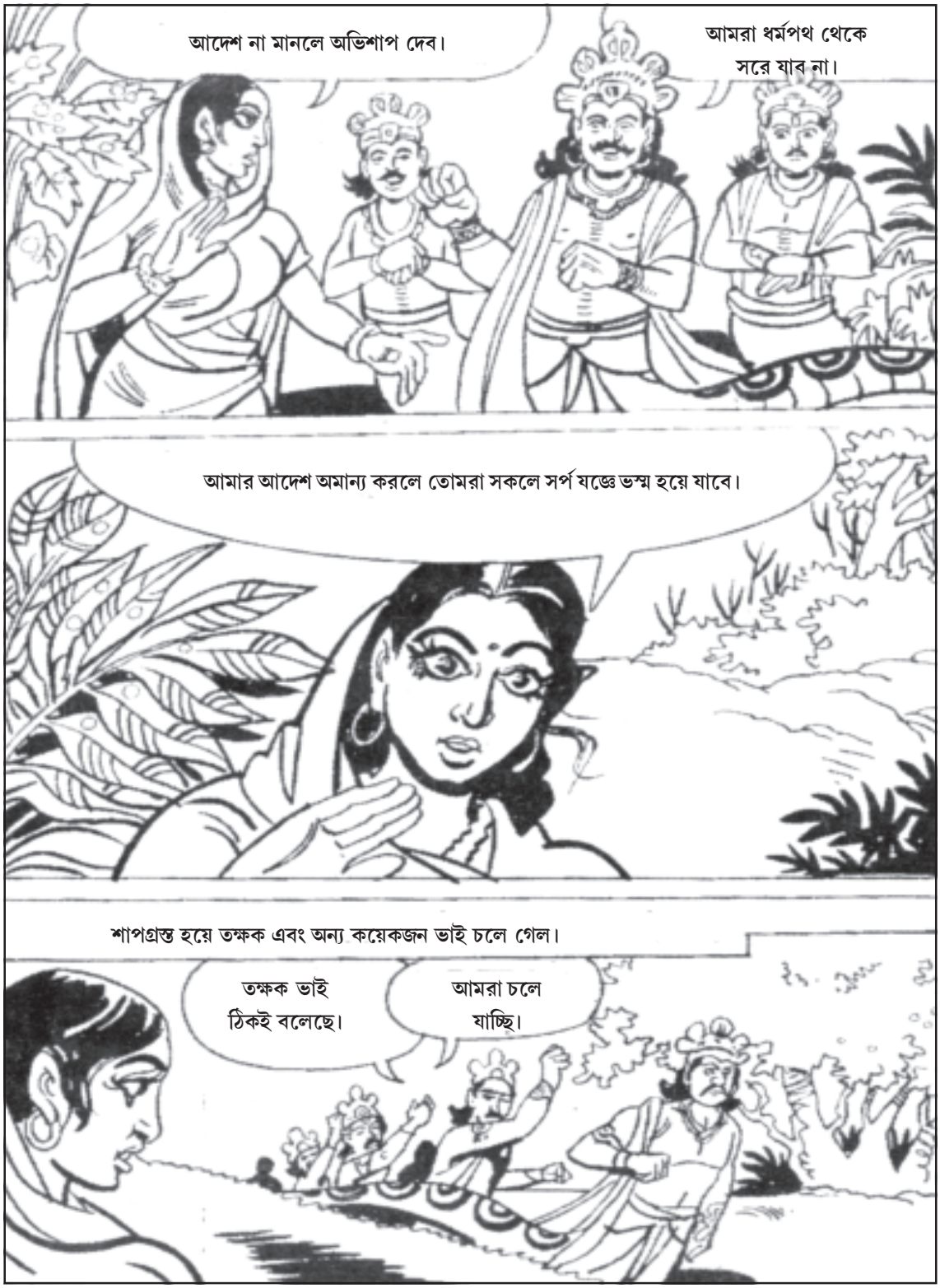

Swastika RNI No. 5257/57
16 May - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

গর্জে উঠুক বিপুল জনতা

কেউ কেউ বলছে যে এবার — 'এক জাতি এক প্রাণ' কেন হবে না? কেন হবে না Common Civil Code? কেন হবে না সকল ভারতবাসীর জন্য এক আইন? স্বাধীনতার ৬৪ বছর পরেও যদি না হয় তাহলে যে মহাবিপদ সামনে এগিয়ে আসছে, আমরা তার থেকে মুক্ত হব কিভাবে? এই সমস্যার কথা — এবার বিপুল জনতার সামনে, প্রচারের মাধ্যমে, বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরব, ক্রমাগত — বছরের পর বছর। জনতা বিচার করবে, কী করা যায়। কেমন করে আন্দোলন করা যায়। এভাবেই একদিন ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে উঠবে জনতার মাঝখান থেকে। অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চাই (Common Civil Code চাই), সংখ্যালঘু তকমার বিলুপ্তি চাই। সমস্ত ভারতবাসীর জন্য এক আইন চাই। এ লড়াই বিপুল জনতার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে Forum of Nationalist Thinkers, প্রচারের কাজ শুরু করেছে। সকলের যোগদান আহ্বান করছে। সকলের সবরকম সাহায্য প্রার্থনা করছে। এ লড়াই আমাদের সকলের। হিন্দুস্থান অমর রহে। বন্দেমাতরম্।।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন

প্রধান নির্দেশিকা (ইস্যু) মাত্র দু'টি

এক - শাসকের সর্বস্তরে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি।

দুই - অভিন্ন দেওয়ানী বিধি (Common Civil Code)

-- Courtesy --

Issued in Public Interest by

FORUM OF NATIONALIST THINKERS

12, Waterloo Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 069
Mob. : 9051498919 / 9433047202

দাম : ৫.০০ টাকা